Kobitor.com গল্পের ওয়েবসাইট,

আমি পদ্মজা - ১১

_____

মাঘ মাস চলছে। কেটে গেছে চার মাস। শুষ্ক চেহারা আর হিমশীতল অনুভব নিয়ে পদ্মজা বসে আছে নদীর ঘাটে। গুনে গুনে তিন নম্বর সিঁড়িতে। নাকের ডগায় মেট্রিক পরীক্ষা। দিনরাত পড়তে হচ্ছে। নিয়ম করে প্রতিদিন ভোরে পড়া শেষ করে পদ্মজা। এরপর ঘাটে এসে বসে নিজের অনুভূতিদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য। কখনো উদাস হয়ে আবার কখনো লাজুক মুখশ্রী নিয়ে ভাবে কারো কথা। সেই যে চিঠি দিয়ে হারালো আর সাক্ষাৎ মিললো না তার। কখনো কী মিলবে? তিনি কী আসবেন? এক চিঠি প্রতিদিন নিয়ম করে পড়ে পদ্মজা। ধীরে ধীরে অনুভব করে তার মধ্যে আছে অন্য আরেক সত্ত্বা। যে সত্ত্বা প্রতিটি মেয়ের অন্তঃস্থলের গভীরে জেঁকে বসে থাকে ভালবাসার অনুভূতি নিয়ে। পূর্ণা আসল শীতের চাদর মুড়ি দিয়ে। দুই দিন আগে তার অষ্টম শ্রেণির চূড়ান্ত পরীক্ষা শেষ হয়েছে। হিমেল হাওয়ার হাড় কাঁপানো শীতে পূর্ণা থেমে থেমে কাঁপছে।

'আপা?'

পদ্মজা তাকাল। মৃদু হেসে বলল, 'কী?' পরপরই আবার উৎকণ্ঠা নিয়ে বলল, 'আম্মা আবার অসুস্থ হয়ে পড়ছে?'
পূর্ণা পদ্মজার পাশ ঘেঁষে বলল,'না, আম্মার কিছু হয় নাই।'

পদ্মজা হাঁফ ছেড়ে বলল,'আম্মা সারাদিন সেলাইর কাজ করে। একদিকে তাকিয়ে থাকে, এক জায়গায় বসে থাকে। এজন্যই শরীরে এতো অশান্তি। দূর্বল হয়ে পড়ছে। আব্বারে বলিস, আম্মারে নিয়ে সদরে যেতে। আমার কথা তো আব্বা শুনবে না।'
'আচ্ছা।'

দুজন নদীর ওপারে চোখ রাখল। অতিথি পাখির মেলা সেখানে। রোমাঞ্চকর আকর্ষণ। এত পাখি দেখে মন ভরে গেল। পাখিদের কলকাকলিতে এলাকা মুখরিত। এপার থেকে শোনা যাচ্ছে। কোত্থেকে দৌড়ে আসে প্রান্ত। সে চার মাসে শুদ্ধ ভাষা রপ্ত করে নিয়েছে ভালভাবে। এসেই বলল, 'আপারা কী করো?'
পূর্ণা বলল,'পাখি দেখি। আয়, দেখে যা।'

প্রান্ত দূরে চোখ রাখল। সকালের ঘন কুয়াশার ধবল চাদরে ঢাকা নদীর ওপার। পাখিদের ভাল করে চোখে ভাসছে না। শীতের দাপটে প্রকৃতি নীরব। তাই পাখির কলকাকলি শোনা যাচ্ছে দারুণভাবে। প্রান্ত বলল, 'বড় আপা,একটা পাখি ধরে আনি?'
'একদম না। পাখি ধরা ভাল না। অতিথি পাখিদের তো ভুলেও ধরা উচিত না। ওরা আমাদের দেশে অতিথি হয়ে এসেছে।'
প্রান্ত চুপসে গেল। এরপর মিইয়ে যাওয়া গলায় বলল,'আচ্ছা,ঠিকাছে।'

'তোরা এইহানে কী করস?'

মোর্শেদের কণ্ঠস্বর শুনে তিনজন ফিরে তাকাল। প্রান্ত হাসিমুখে ছুটে এসে বলল, 'আব্বা,আমি আজ তোমার সাথে মাছ ধরতে যাব।'
মোর্শেদ প্রান্তকে কোলে তুলে নেন। এরপর বললেন,'তোর মায় আমার লগে কাইজ্জা করব।'

'আম্মারে, আমি বলব।'
'আইচ্ছা যা, তুই রাজি করাইতে পারলে লইয়া যামু।'

পদ্মজা চোখ দুটি জ্বলজ্বল করে উঠল। মোর্শেদ গত দু'মাস ধরে প্রান্তকে চোখে হারাচ্ছেন। ছেলে নাই বলেই হয়তো!প্রতিটা বাবা-মায়ের একটা ছেলের আশা থাকে।
হেমলতা পর পর তিনটা মেয়ে জন্ম দিলেন। এ নিয়ে মোর্শেদ অভিযোগ করেননি। তবে, মনে মনে খুব করে একটা ছেলে চাইতেন। প্রান্তকে যখন প্রথম আনা হলো, মোর্শেদের খুব রাগ হয় ভিক্ষুকের ছেলে বলে। সময়ের সাথে সাথে প্রান্তকে চোখের সামনে ঝাঁপাতে, লাফাতে দেখে ছেলের জন্য রাখা মনের শূন্যস্থানটা নাড়া দিয়ে উঠল। মোর্শেদ দু'হাত বাড়িয়ে দেন অনাথ ছেলেটির দিকে। এখন দেখে আর বোঝার উপায় নেই, মোর্শেদ আর প্রান্তের মধ্যে রক্তের কোনো সম্পর্ক নেই। মোর্শেদ কাঠখোট্টা গলায় দুই মেয়েকে বললেন,'সদরে যাইয়াম। দুইডার লাইগা চাদর আনতাম না সুইডার?'

পদ্মজা কথাটা শুনে চমকাল। অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু পেলে মানুষ কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায়। পদ্মজার অবস্থাও তাই হলো। খুশিটা প্রকাশ করার মতো পথ খুঁজে পাচ্ছে না। স্নায়ু কোষ থমকে গেছে। শীতের তান্ডবে প্রকৃতি বিবর্ণ অথচ তার মনে হচ্ছে, বসন্তকাল চলছে। ঢোক গিলে ঝটপট উত্তর দিল,'আব্বা,তোমার যা পছন্দ তাই এনো আমার জন্য।'

খুশিতে পদ্মজার গলা কাঁপছে। মোর্শেদ অনুভব করলেন সেই কাঁপা গলা। গত সপ্তাহ রমিজের মেয়ে এক ছেলের সাথে রাত কাটাতে গিয়ে ধরা পড়ে। অলন্দপুরে সে কী তুলকালাম তাণ্ডব! ছেলেটাকে ন্যাড়া করে জুতার মালা পরিয়ে চক্কর দেওয়ানো হয়েছে পুরো অলন্দপুর। আর মেয়ের পরিবারকে সমাজ থেকে আলাদা করে দেয়া হয়েছে। পদ্মজা এতো সুন্দর হওয়া সত্ত্বেও আজও কোনো চারিত্রিক দোষ কেউ দিতে পারেনি। মেয়েটার দ্বারা কোনো অনৈতিক কাজ হয়নি। তার ঘরে যেন সত্যি একটা পদ্মফুলের বাস। মোর্শেদ পদ্মজাকে নিয়ে দোটানায় ভোগেন। খারাপ ব্যবহারটা আগের মতো আসে না। তিনি দ্রুত জায়গা ত্যাগ করেন।

_____
পরদিন সকাল সকাল কলস ভরে খেজুরের মিষ্টি রস নিয়ে আসেন মোর্শেদ। প্রেমা খেজুরের রস দেখেই মাকে বলল, 'আম্মা,পায়েস খাবো।
'আচ্ছা, খাবি।'

সূর্য অনেক দেরিতে উঠল। প্রকৃতির ওপর সূর্যের নির্মল আলো ছড়িয়ে পড়ে। সূর্যের আলোতে কোনো তেজ নেই। চার ভাই-বোন কাঁচা খেজুরের রস নিয়ে উঠানে বসল পাটি বিছিয়ে। খেজুরের কাঁচা রস রোদে বসে খাওয়াটাই যেন একটা আলাদা স্বাদ,আলাদা আনন্দ। মোর্শেদ নারিকেল গাছে উঠেছেন। পায়েসের জন্য নারিকেল অপরিহার্য উপকরণ। আচমকা পদ্মজা প্রশ্ন করল, 'আজ কী সোমবার? '
পূর্ণা কথা বলার পূর্বে হেমলতা বারান্দা থেকে বললেন, 'আজ তো সোমবারই। কেন?'
পদ্মজা খেজুরের বাটি রেখে ছুটে আসল বারান্দায়।
'আজ স্কুলে যাওয়ার কথা ছিল আম্মা। ঝুমা ম্যাডাম বলেছিলেন,গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে। সবাইকে যেতে বলেছেন।'

'আমায় বলে রাখতি। সামনে পরীক্ষা। গুরুত্বপূর্ণ দেখে পড়া দিবেন এজন্যই ডেকেছেন। তাড়াতাড়ি যা। এই পূর্ণা, তুইও যা।'

দুই বোন বাড়ি থেকে দ্রুত বের হলো। সূর্য উঠলেও কনকনে শীতটা রয়ে গেছে। দুজনের গায়ে মোর্শেদের আনা নতুন সোয়েটার। পদ্মজা যখন মোর্শেদের হাত থেকে সোয়েটার পেল আবেগ লুকিয়ে রাখতে পারেনি। মোর্শেদের সামনে হাউমাউ করে কান্না করে উঠে। মোর্শেদ অপ্রস্তুত হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। ফিরেন অনেক রাত্রিরে। পূর্ণা বলল, 'আব্বার পছন্দ ভালো তাই না আপা?'
'কীসের পছন্দ?'
'সোয়েটার গুলো কী সুন্দর।'

পদ্মজা হাসল। সামনের ক'টি দাঁত ঝিলিক দিল। হাতের ডান পাশে ধানক্ষেত। ধান গাছের ডগায় থাকা বিন্দু বিন্দু জমে থাকা শিশির রোদের আলোয় ঝিকমিক করছে। অনেকে হাতে কাঁচি নিয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছে ধান কাটার। বাতাসে নতুন ধানের গন্ধ। হঠাৎ পূর্ণা চেঁচিয়ে উঠল, 'আপারে, লিখন ভাই।'

পদ্মজার নিঃশ্বাস গেল থমকে। মুহূর্তে বুকের মাঝে শুরু হয় তাণ্ডব। পূর্ণার দৃষ্টি অনুসরণ করে পিছনে তাকাল পদ্মজা। লিখন ব্যস্ত পায়ে এদিকে আসছে। পাশে মগা।
পদ্মজা অজানা আশঙ্কায় চোখ ফিরিয়ে নিল। পূর্ণাকে বলল, 'এখানে আর এক মুহূর্তও না।' কথা শেষ করে পদ্মজা স্কুলের দিকে হাঁটা শুরু করল। পূর্ণা অবাক হয়। কিন্তু, এ নিয়ে রা করল না। লিখন পিছন পিছন আসছে। পদ্মজার বুক কাঁপছে বিরতিহীন ভাবে। চাহনি অশান্ত।

চলবে...
®ইলমা বেহরোজ

আমি পদ্মজা - ১২

বট গাছের সামনে চিন্তিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে লিখন।
শীতের শুষ্কতায় বটগাছের অধিকাংশ পাতা ঝরে পড়েছে। লিখনের কাছে শীতকাল খুবই অপছন্দের ঋতু। শীত চরম শুষ্কতার রূপ নিয়ে প্রকৃতির ওপর জেঁকে বসে থাকে যা সহ্য হয় না লিখনের। ঠান্ডা লেগেই থাকে। ছোট থেকে কয়েকবার নিউমোনিয়ায় ভুগেছে। সে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে রুক্ষতা, তিক্ততা ও বিষাদের প্রতিমূর্তি শীতকাল। তখন পদ্মজা এতো দ্রুত হাঁটছিল যে মনে হচ্ছিল, সে পালাতে চাইছে। লিখন আর এগোয়নি। পালাতে দিল পদ্মজাকে। মগা বলেছে, পদ্মজার লোকসমাজের ভয় খুব। তাই লিখন এই নির্জন মাঠের পাশে বটগাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। পদ্মজা এ পথ দিয়েই বাড়ি ফিরবে। তখন যদি একটু কথা বলা যায়।

পদ্মজা জড়সড় হয়ে হাঁটছে। আতঙ্কে ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ। বার বার জিহবা দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিচ্ছে।
পদ্মজা মিনমিনে গলায় পূর্ণাকে ডাকল, 'পূর্ণা রে..."

পূর্ণা তাকাল। পদ্মজা এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, 'আমার ভয় হচ্ছে। উনি মাঝপথে দাঁড়িয়ে নেই তো?'

পূর্ণা চরম বিরক্তি নিয়ে বলল, 'থাকলে কী হয়েছে? খেয়ে ফেলবে?'

পদ্মজা আর কথা বলল না। পূর্ণার সাথে কথা বলে লাভ নেই। তখন লিখন শাহকে পাত্তা না দেয়ার জন্য পূর্ণার খুব রাগ হয়েছে। পদ্মজা বরাবরই মাথা নিচু করে হাঁটে। তাই লিখন শাহকে দেখতে পেল না। পূর্ণা দূর থেকে দেখতে পেল। কিন্তু এইবার আর আগে থেকে বলল না পদ্মজাকে। সে উত্তেজিত হয়ে পড়ে। ভাবে, লিখন শাহ্ যখন আপার সামনে এসে দাঁড়াবে কী যে হবে!

লিখন-পদ্মজার দূরত্ব মাত্র কয়েক হাত। তখন পদ্মজা আবিষ্কার করল লিখনের উপস্থিতি। ওড়নার ঘোমটা চোখ অবধি টেনে নেয় দ্রুত। ভয়ে-লজ্জায় সর্বাঙ্গে কাঁপন ধরে। লিখনের পাশ কাটার সময় পুরুষালি একটি কণ্ঠ ডেকে উঠল, 'পদ্ম।'

পদ্মজা দাঁড়াতে চায়নি। তবুও কেন জানি দাঁড়িয়ে গেল। লিখন দুয়েক পা এগিয়ে আসল। পূর্ণা ঠোঁট টিপে সেই দৃশ্য গিলছে। লিখন উসখুস করছে। কথা গুলিয়ে ফেলেছে। পদ্মজা লিখনকে পিছনে ফেলে সামনে এগিয়ে গেল। লিখন হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে দেখল। পূর্ণা বলল, 'আমাকে বলুন, আমি বলে দেব।'

লিখন পকেট থেকে একটা চিঠি বের করল। এরপর অনুরোধ স্বরে বলল,'দয়া করে, তোমার বোনকে দিও। আমি কাল বিকেলে ঢাকা চলে যাব।'
পূর্ণা হাসিমুখে চিঠি নিল। এরপর বলল, 'আপা আপনার আগের চিঠিটা প্রতিদিন পড়ে।'

লিখনের ঠোঁট দু'টি হেসে উঠল। পূর্ণা দৌড়ে ছুটে গেল পদ্মজার দিকে। লিখন আর পিছু নিল না। পূর্ণা আসতেই পদ্মজা ধমকে উঠল, 'কী কথা বলছিলি এতো? কেউ দেখলে কী হতো? তুই আম্মার কথা কেন ভাবছিস না।'

পদ্মজার কাঁদোকাঁদো স্বরে পূর্ণা চুপসে গেল। সত্যি কী সে বেশি করে ফেলল? পূর্ণা চোখ নামিয়ে চুপচাপ হেঁটে বাড়ি চলে আসে। চিঠির কথা পদ্মজাকে বলা হয়নি।

_____
গোধূলি বিকেল। হেমলতা পদ্মজাকে ফরমায়েশ দেন, 'পদ্ম, কয়টা টমেটো নিয়ে আয়।'
'আচ্ছা আম্মা।'

পদ্মজা লাহাড়ি ঘরের ডান দিকে হেঁটে আসে। দু'মাস আগে মোর্শেদ এ'দিকের সব ঝোপজঙ্গল সাফ করে টমেটোর ছোটখাটো ক্ষেত করেছেন। লাল টকটকে টমেটো। হেমলতা রান্নার ফাঁকে বারান্দার দিকে উঁকি দিলেন। মোর্শেদ আর প্রান্ত কিছু নিয়ে বৈঠক করছে।

হেমলতা ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়েন। বাসন্তী নামক মানুষটা কী জন্যে ত্যাগের স্বীকার হলো? জানতে ইচ্ছে করলেও হেমলতা প্রশ্ন করেন না। তবু এতটুকু বুঝেছেন মোর্শেদের বাইরের ঘোর কেটে গেছে। যার ফলস্বরূপ সংসারে তার মন পড়েছে। হেমলতাকে খুব সমীহ করে চলেন। তবে হেমলতা জানেন, মোর্শেদ পদ্মজাকে নিজের মেয়ে হিসেবে এখনো বিশ্বাস করেননি। তা নিয়ে মাঝে মাঝে খোঁচা দিতেও ভুলেন না।

পদ্মজা সাবধানে ক্ষেতের মধ্যিখানে আসল। টমেটো ছিঁড়তে গিয়ে তার লিখনের কথা মনে হলো। মনে মনে ভাবে, কেন এসেছেন তিনি? কি বলতে চেয়েছিলেন?
জানার জন্য পদ্মজার মনটা ব্যকুল হয়ে হয়ে উঠল।

'আপা,একটা কথা বলি?'

পদ্মজা চমকে তাকাল। হঠাৎ পূর্ণার আগমনে ভয় পেয়েছে। বুকে ফুঁ দিয়ে বলল, 'বল।'
'রাগ করবে না তো?'
পদ্মজা চোখ ছোট ছোট করে তাকাল। বলল, 'করব না।'
পূর্ণা লিখনের দেয়া চিঠি দেখিয়ে বলল, 'লিখন ভাইয়ার চিঠি।'

পদ্মজা ছোঁ মেরে চিঠি নিল। পূর্ণা অবাক হলো। মনে মনে খুশি হলো পদ্মজার আকুলতা দেখে। পদ্মজা দ্রুত চিঠির ভাঁজ খুলল। পূর্ণা বাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখছে, কেউ আসছে নাকি! পদ্মজা পড়া শুরু করল।

প্রিয় পদ্ম ফুল,

চার মাস কেটে গেল। চার মাসে একটুর জন্যও অবসর মেলেনি। কিন্তু মনে ছিল এক আকাশ ছটফটানি। তোমার মনের কথা তো জানাই হলো না। তোমাদের অলন্দপুরের প্রায় প্রতিটি বাড়ির ছেলের স্বপ্ন তোমাকে ঘরে তোলার। তাই সারাক্ষণ ভয়ে ছিলাম। আমার অনুপস্থিতিতে কেউ তুলে নেয়নি তো! তিন দিনের সময় নিয়ে চলে এসেছি। শুধু একবার দেখতে আর জানতে, তুমি কী আমার জন্য অপেক্ষা করবে? মেট্রিক পরীক্ষা অবধি অপেক্ষা করলেই হবে। এরপর আমি আমার মা আর বাবাকে নিয়ে তোমার মায়ের কাছে আসব। উনার কাছে অনুরোধ করব, তোমার পড়া শেষ হলে যেন আমার সাথেই বিয়ে দেন। তখন অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারব। এখন অনিশ্চয়তায় ভুগছি। আমি গুছিয়ে লিখতে পারছি না আজ। কয়েকটা চিঠি লিখেছি। একটাও মনমতো হয়নি। অনুগ্রহ করে তুমি মানিয়ে নিও।

ইতি
লিখন শাহ্

বাড়ির সবাই ঘুমে। পদ্মজা চুপিচুপি উঠে বসল পড়ার টেবিলে। রাত অনেক। গাছের পাতায় নিশ্চয় শিশির বিন্দু জমছে। এরপর ভোররাতে টিনের চালে শিশিরকণা বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টির

মতো ঝরবে। গাঁ হিম করা ঠান্ডা। তা উপেক্ষা করে পদ্মজা হাতে কলম তুলে নিল। সাদা কাগজে লিখল, অপেক্ষা করব আমি। এরপর কাগজটা ভাঁজ করে বালিশের তলায় রেখে শুয়ে পড়ল।

ফজরের নামায পড়ে চার ভাইবোন পড়তে বসল। পড়ায় মন টিকছে না পদ্মজার। বই আনার ছুতোয় পদ্মজা রুমে গেল। রাতের লেখা কাগজটা ছিঁড়ে কুটিকুটি করে জানালার বাইরে ফেলে দিল। এরপর আবার নতুন করে লিখল, আমার আম্মা যা চান তাই হবে।

পড়াশেষে নিয়মমাফিক ঘাটে আসল পদ্মজা। হাতের মুঠোয় তিনটা চিঠি। দু'টো লিখনের। একটা তার লেখা। পূর্ণাও পাশে। প্রেমা, প্রান্ত বাড়িজুড়ে ছুটাছুটি করছে। সামনের কোনোকিছু ঠিকমতো দেখা যাচ্ছে না। সবকিছুই অস্পষ্ট। কুয়াশার স্তর এত ঘন যে, দেখে মনে হচ্ছে সামনে কুয়াশার পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। সেই পাহাড় ভেদ করে একটা নৌকা এসে ঘাটে ভীরে। নৌকায় লিখন আর মগা। আকস্মিক ঘটনায় পদ্মজার পিল উঠল চমকে। পালানোর মতো শক্তিটুকু পায়ে নেই। লিখন মায়াভরা কণ্ঠে পদ্মজার উদ্দেশ্যে বলল, 'আমি বাধ্য হয়ে এসেছি। আজ বিকেলে চলে যাব। মগা বলল, প্রতিদিন সকালে ঘাটে নাকি বসো তুমি। তাই এসেছি।'

পদ্মজা মনে মনে সূরা ইউনুস পড়ছে। ভয়ে বুক দুরুদুরু করছে। মা দেখে ফেললে কী হবে? বা অন্য কেউ? একটু সাহস যোগাতেই নিজের লেখা চিঠি সিঁড়িতে রেখে, পদ্মজা ছুটে গেল বাড়িতে। পূর্ণা বড় বড় চোখে শুধু দেখল। লিখন নৌকা থেকে নেমে চিঠিটা হাতে তুলে নিল। ভাঁজ খুলে একটা লাইন পেল শুধু। লিখনের মুখে বিষাদের ছায়া নেমে আসে। পূর্ণার কৌতূহল হলো চিঠিতে কী আছে জানার জন্য। তবে তা প্রকাশ করল না। শুধু বলল, 'আপা আপনার কথা প্রতিদিন ভাবে।'

১৯৯৬ সাল। পদ্মজা থেমে থেমে কাঁপছে। হাঁটুর উপর মুখ লুকিয়ে রেখেছে। তুষার কালো চাদর তার গায়ে টেনে দিল। পদ্মজা চোখ তুলে তাকাল। বিষাদভরা কণ্ঠে বলল, ' সেদিন আমার লেখা প্রথম চিঠিটা কুটিকুটি কেন করেছি,জানি না। ইচ্ছে হয়েছিল তাই করেছি। তবে জানেন, আমি একদম ঠিক করেছিলাম। সেদিন যদি আমি কথা দিয়ে দিতাম। আমার কথা ভঙ্গ হতো।'

পদ্মজা হাসল। তুষার এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল পদ্মজার দিকে। এরপর বলল, 'লিখনের সাথে আর দেখা হয়নি?'

পদ্মজা হাতের কাঁটা অংশে ফুঁ দিয়ে বলল, 'হয়েছিল।'

'তাহলে, কথা ভঙ্গ হতো কেন বললেন?'

পদ্মজা তুষারের দিকে তাকাল। এরপর আবার হাঁটুতে মুখ লুকালো। এক মিনিট, দুই মিনিট, তিন মিনিট করে করে দশ মিনিট কেটে গেল। পদ্মজার সাড়া নেই। তুষার ডাকল, 'পদ্মজা? শুনতে পাচ্ছেন?'
'পাচ্ছি।'
'আপনার কী কষ্ট হচ্ছে?'

'হচ্ছে।'
'মুখ তুলে তাকান।'

পদ্মজা ছলছল চোখে তাকাল। তুষার উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, 'কী সমস্যা হচ্ছে?'

তুষারের প্রশ্ন অগ্রাহ্য করে পদ্মজা ভেজা কণ্ঠে বলল, 'আমার আম্মা আমার সাথে কেন বিশ্বাসঘাতকতা করল?'

তুষার চমকাল। হেমলতা নামে মানুষটার সম্পর্কে যা জানল, তাতে তার নামের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা শব্দটা যায় না। পরপরই নিজেকে সামলে নিল। এমন কেইস শত শত আছে। ভাল মানুষের খারাপ রূপ। তুষার সাবধানে প্রশ্ন করল, 'কী করেছেন তিনি?'

পদ্মজা উত্তর দিল না। ফ্লোরে শুয়ে পড়ল। চোখ বুজল। তুষার গোপনে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। পদ্মজা এখন আর কিছু বলবে না। সে ক্লান্ত। অতীত হাতড়াতে গিয়ে মনের অসুস্থতা বেড়ে গেছে তার। তুষার পদ্মজার মুখের দিকে তাকাল। আঁচল সরে গেছে বুক থেকে। চাদরের অংশ ফ্লোরে পড়ে আছে। তুষার চাদরটা টেনে দিতে গিয়ে আবিষ্কার করল, পদ্মজার গলায় কালো-খয়েরি মিশ্রণে কয়টা দাগ। গলা টিপে ধরার দাগ! তুষার হুংকার ছাড়ল, 'ফাহিমা?'

ফাহিমা কাছেই ছিল। ছুটে আসল। তুষার বলল, 'আপনি আসামীর গলা টিপে ধরেছেন?'

ফাহিমা চট করে বলল, 'না, স্যার। প্রথম থেকেই গলায় দাগ গুলো দেখছি। প্রশ্নও করেছি। মেয়েটা উত্তর দিল না।'

তুষার কপাল ভাঁজ করে ফেলল। হাজারটা প্রশ্নে মাথা ভনভন করছে। মস্তিষ্ক শূন্য প্রায়। পদ্মজা যতটুকু বলেছে তার পরবর্তী সাত বছরে কী কী হয়েছিল, না জানা অবধি শান্তি মিলবে না। মাথা কাজ না করলে তুষার সিগারেট টানে। তাই বেরিয়ে গেল।

চলবে...
®ইলমা বেহরোজ

আমি পদ্মজা - ১৩

বাড়ির গিন্নির মতো কোমরে ওড়নার আঁচল গুঁজে রান্নাবান্না করছে পদ্মজা। হেমলতার কোমরে ব্যাথা। তিনি রান্না করতে চাইলেও পদ্মজা রাঁধতে দিল না। মোর্শেদও বললেন, 'বেদনা লইয়া রান্ধা লাগব না। তোমার মাইয়া যহন রানতে পারে তে হেই রান্ধক।'

শেষ অবধি হেমলতা হার মানলেন। পদ্মজা মাটির চুলায় মুরগি মাংস রান্না করছে। খড়ি বা লাকড়ি হিসেবে আছে বাঁশের মুড়ো। আগুনের শিখার রং নীলচে। শীতের মাঝে রান্নার করার শান্তি আলাদা। মুরগি মাংস রান্না হচ্ছে। আজ এতিম-মিসকিন খাওয়ানো হবে। হেমলতা বলেন, সামর্থ্য থাকলে মাসে একবার হলেও এতিম-মিসকিনদের খাওয়ানো উচিৎ। নয়তো ঘরে রহমত থাকে না। রান্না শেষ করে পদ্মজা হেমলতার কাছে এলো। বলল, 'আম্মা, রান্না শেষ।'

শুকনো মুখখানা তুলে তাকালেন হেমলতা। বললেন, 'তোর আব্বারে গিয়ে বল, আলী,মুমিন,ময়না তিনজনরে নিয়ে আসতে।'

পদ্মজা কিছু না বলে মাথা নিচু করে ফেলল। মোর্শেদের সাথে আগ বাড়িয়ে কথা বলতে তার ভয় হয়। অনেকদিন বাজে ব্যবহার করেন না। হুট করে যদি করে ফেলেন। কষ্ট হবে। হেমলতা মৃদু হাসলেন। বললেন,'কিছু বলবে না। যা তুই।'
পদ্মজা দূর্বল গলায় বলল, 'সত্যি যাব?'

হেমলতা মাথা সামনে ঝুঁকে ইঙ্গিত করেন, যাওয়ার জন্য। পদ্মজা মোর্শেদকে উঠানেই পেল। মোর্শেদ চেয়ারে বসে রোদ পোহাচ্ছেন। পদ্মজা গুটিগুটি পায়ে হেঁটে আসল। আব্বা ডাকতে গিয়ে গলা ধরে আসছে তার। ঢোক গিলে ডাকল, 'আব্বা?'

মোর্শেদ তাকান। পদ্মজার মনে হলো বুকে কিছু ধপাস করে পড়ল। পদ্মজা দৃষ্টি অস্থির রেখে মিনমিনে গলায় বলল,'আম্মা বলছে, আলীদের নিয়ে আসতে।'

' রান্ধন শেষ?'

'জি, আব্বা।'

মোর্শেদ গলায় গামছা বেঁধে বেরিয়ে যান। পদ্মজা মোর্শেদের যাওয়ার পানে তাকিয়ে থাকল বেশ কিছুক্ষণ। অনুভূতিগুলো থমকে গেছে। পদ্মজার চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসল। তাড়াতাড়ি ডান হাতের উল্টো পাশ দিয়ে চোখের জল মুছল। গাছ থেকে পাখির কিচিরমিচির শব্দ আসছে। সে সেদিকে তাকাল। তখনি হেমলতা ডাকলেন, 'পদ্ম।'
পদ্মজা ছুটে গেল। হন্তদন্ত হয়ে রুমে ঢুকে বলল, 'কিছু লাগবে আম্মা?'
'না। পূর্ণারা কোথায়?'
'ঘাটে।'
'কী করে?'
'মাছ ধরে।'
'বড়শি দিয়ে?'
'জালি দিয়ে।'
'এতো বড় মেয়ে নদীতে নেমে জাল দিয়ে মাছ ধরে! আচ্ছা, থাকুক। তুই আয়। বস আমার পাশে।'

পদ্মজা হেমলতার পায়ের কাছে বসল। পায়ে হাত দিল টিপে দেওয়ার জন্য। হেমলতা পা সরিয়ে নিতে নিতে বললেন, 'লাগবে না।'

এরপর শাড়ির আঁচল দিয়ে পদ্মজার কপালের ঘাম মুছে দিলেন। বললেন, 'কোমরের ব্যাথাটা কমে আসছে। তোর আব্বা কিছু বলছে?'
'না, আম্মা। আচ্ছা আম্মা, আব্বা এতো পাল্টাল কী করে?'

হেমলতা মৃদু হাসেন। উদাস হয়ে টিনের দেয়ালে তাকান। এরপর বললেন, 'তোর বাপ ভালো মানুষ শুনছিলাম। কিন্তু বিয়ের পর তার ভালমানুষি দেখিনি ভুলেও। কারণ, তার কানে, মগজে মন্ত্র দেয়ার মানুষ ছিল। অন্যের নিয়ন্ত্রণে ছিল। এখন আর কেউ নিয়ন্ত্রণ করে না তাই পাল্টাচ্ছে। তোর বাপের ব্যক্তিত্ব নাই। নিজস্ব স্বকীয়তা নাই। অন্যের কথায় নাচে ভালো।'

শেষ কথাটা হেমলতা হেসে বললেন। পদ্মজা কিছু বলল না। হেমলতা শুয়ে পড়লেন। আজ সারাদিন বিশ্রাম নিবেন। আগামীকাল অনেক কাজ। অনেকগুলো কাপড় জমেছে।

'রূপ ক্ষণিকের, গুণ চিরস্থায়ী। শেষ বয়েসে এসে আব্বা বুঝছে।'

পদ্মজার শীতল কণ্ঠ এবং কথার তীরে হেমলতা ভীষণভাবে চমকালেন। তিনি সেকেন্ড কয়েক কথা বলতে পারলেন না। পদ্মজা চলে যাওয়ার জন্য উপক্রম হয়। হেমলতা অবিশ্বাস্য স্বরে প্রশ্ন ছুঁড়লেন, 'এই খবর কোথায় শুনেছিস?'

পদ্মজা ঘাড় ঘুরে ফিরল। বলল, 'আমি তো তোমারই মেয়ে, আম্মা।'

পদ্মজা চলে গেল। রেখে গেল হেমলতার অবিশ্বাস্য চাহনি।

বিকেলবেলা হেমলতা ঘর থেকে বের হলেন। শরীরে শান্তি এসেছে। পূর্ণা বরই ভর্তা করছিল। পাশে প্রেমা। পদ্মজাকে দেখা গেল না। নিশ্চয়ই ঘাটে বসে আছে। প্রান্তও তো নেই। হেমলতা পূর্ণাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'পূর্ণা, প্রান্ত কোথায়?'

পূর্ণা কয়েক সেকেন্ড ভাবল কী উত্তর দিবে। এরপর ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল, 'জানি না আম্মা।'
'জানস না কী? প্রেমা, প্রান্ত কই?'
প্রেমা সহজ স্বরে বলল, 'আমরা ঘাটে ছিলাম। প্রান্ত উঠানে ছিল। এরপর এসে দেখি নাই।'
হেমলতা গলা উঁচিয়ে বলেন, 'কোন মুখে বলছিস জানি না? একসাথে নিয়ে থাকতে পারিস না। একা ছাড়িস কেন? কোথায় গেছে ছেলেটা।'

পদ্মজা বাড়ির পিছন থেকে ছুটে আসল। হেমলতার ধমক ঘাট অবধি শোনা গেছে।
'কী হয়েছে?'
'প্রান্ত বাড়ি নাই। দুইটা এই কথা বলেও নাই। বসে বরই ভর্তা করে খাচ্ছে। দিন দিন অবাধ্য হচ্ছে মেয়েগুলো।'

পূর্ণা ভয়ে জড়সড় হয়ে বসে আছে। প্রেমা হেমলতার ধমকে ভয় পাচ্ছে কিন্তু অতোটা না। হেমলতার মন কু গাইছে। তিনি নিজ রুমে যেতে যেতে পদ্মজাকে বললেন, 'বের হচ্ছি আমি। সাবধানে থাকবি।'

Kobitor.com

দুজন লোক প্রান্তকে নিয়ে বাড়িতে ঢুকল। প্রান্তর কপাল বেয়ে রক্ত ঝরছে। পদ্মজা হেমলতাকে ডাকল, 'আম্মা।' এরপর দৌড়ে এলো উঠানে। প্রান্ত কাঁদছে। হেমলতা ব্যস্ত পায়ে বেরিয়ে আসেন। প্রান্তকে আহত অবস্থায় দেখে ভড়কে যান। বুকটা হাহাকার করে উঠে। তিনি ছুটে আসেন। প্রান্তকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে লোক দুটিকে উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'কী হয়েছে?'

একজন লোক বলল, 'পলাশ মিয়ার ছেড়ার লগে মাইর লাগছিল। হেই ছেড়ায় পাথথর দিয়া ইডা মারছে। আর ফাইট্টা গেছে।'

মোর্শেদ লাহাড়ি ঘরের সামনে গাছ কাটছিলেন। চেঁচামেচি শুনে এগিয়ে আসেন। প্রান্তকে এমতাবস্থায় দেখে লোক দু'টিকে তেজ নিয়ে বললেন, 'কোন কুত্তার বাচ্চায় আমার ছেড়ারে মারছে? কোন বান্দির ছেড়ার এতো বড় সাহস?'

মোর্শেদ উত্তরের অপেক্ষা করলেন না। প্রান্তকে নিয়ে ছুটে যান বাজারে। হেমলতা রয়ে গেলেন বাড়িতে। বাজারে আজ হাট বসেছে। মোর্শেদ হেমলতাকে নিষেধ করেছেন সাথে যেতে। বাড়িতে থেকে হেমলতা হাঁসফাঁস করতে থাকেন। প্রান্ত একা বড় হয়েছে। কতবার কতরকম আঘাত পেয়েছে। দেখার কেউ ছিল না। তাই মিনমিনিয়ে কেঁদেছে। এমন বাচ্চা ছেলের এতো বড় আঘাত পেয়ে চেঁচিয়ে কাঁদার কথা। কষ্ট তো আর কম পায়নি! দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করেছে। হেমলতার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। পদ্মজা ঘরে লুকিয়ে কাঁদছে। পূর্ণা, প্রেমা বাড়ির বাইরে বার বার উঁকি দিয়ে দেখছে, মোর্শেদ প্রান্তকে নিয়ে ফিরল নাকি!

_____

দেখতে দেখতে চলে এলো মেট্রিক পরীক্ষা। পরীক্ষা কেন্দ্র শহরে। যেতে লাগে ছয় ঘন্টা। বাড়িতে থেকে পরীক্ষা দেয়া অসম্ভব। পরীক্ষা কেন্দ্রের পাশেই মোর্শেদের মামা বাড়ি। মামা নেই। মামাতো ভাইয়েরা আছে। কথাবার্তা বলে, সেখানেই দেড় মাসের জন্য হেমলতা আর পদ্মজা উঠল। মোর্শেদ বাকি দুই মেয়ে আর প্রান্তকে নিয়ে বাড়িতে রয়ে গেছেন। হেমলতা পদ্মজাকে নিয়ে আসার পূর্বে এসে দেখে গেছেন, পরিবেশ কেমন। মোর্শেদের দুই মামাতো ভাইয়ের মধ্যে একজন রাজধানীতে থাকে। আরেকজনের বয়স হয়েছে অনেক। ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দিয়ে বউ নিয়ে একাই থাকেন। ছেলেরা শহরে চাকরি করে। পদ্মজার জন্য উপযুক্ত স্থান। তাই আর অমত করেননি।

মোর্শেদের যে ভাইটি বাড়িতে আছেন, তার নাম আকবর হোসেন। ষাটোর্ধ বয়সের একজন মানুষ। তবে আকবর হোসেনের স্ত্রী জয়নবের বয়স খুব কম। হেমলতার বয়সী। হেমলতা আকবর হোসেনকে ভাইজান বলে সম্বোধন করেন। দালান বাড়ি। বেশিরভাগ সময় বিদ্যুৎ থাকে। ফলে, পদ্মজা মন দিয়ে পড়তে পারছে। পরীক্ষাও ভাল করে দিচ্ছে। হেমলতা আকবর হোসেনের দৃষ্টি অনুসরণ করেছেন। শীতল প্রকৃতির লোক। তিনি নিশ্চিন্তে বিশ্বাসী লোক। রাতের খাবার আকবর হোসেনের সাথেই খেতে হয়। হেমলতা দেড় মাসের খাওয়ার খরচ নিয়ে এসেছেন। আকবর হোসেন কিছুতেই আলাদা রাঁধতে দিচ্ছেন না। এভাবে অন্যের বোঝা হয়ে থাকতে হেমলতার আত্মসম্মানে লাগে। তিনি কথায় কথায় জানতে পারেন, আকবর হোসেন এবং জয়নবের নকশিকাঁথা খুব পছন্দ। তাই তিনি নকশিকাঁথা সেলাই করছেন। যতক্ষণ পদ্মজা পরীক্ষা দেয় ততক্ষণ হেমলতা কেন্দ্রের বাইরে কোথাও বসে বা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেন।

অনেক রাত অবধি পদ্মজা পড়ে। আজ অনেকক্ষণ ধরে সে কী যেন ভাবছে। হেমলতা ব্যাপারটা খেয়াল করেন। পদ্মজার পাশে বসে জিজ্ঞাসা করেন, 'পদ্ম, কী ভাবছিস?'

পদ্মজা এক নজর হেমলতাকে দেখে চোখ ফিরিয়ে নিল। হেমলতা তাকিয়ে আছেন, জানার জন্য। পদ্মজা দ্বিধা নিয়ে বলল, 'রাগ করবে না তো?'
হেমলতা পদ্মজাকে পরখ করে নিলেন। এরপর বললেন, ' কী জানতে চাস?'

পদ্মজা এদিক-ওদিক চোখ বুলায়। কীভাবে শুরু করবে বুঝে উঠতে পারছে না। দুই মিনিট পর নিরবতা ভেঙে বলল,' দুপুর থেকে আমার খুব জানতে ইচ্ছে হচ্ছে, হানিফ মামাকে কে মারল। তোমার সাথে মামার কী কথা হয়েছিল? হানিফ মামাকে... মানে তুমিতো অন্য কারণে গিয়েছিলে। কিন্তু ফিরে এলে। খুনও হলো। আমি সবসময় এটা ভাবি। কখনো উত্তর পাই না। মনে মনে অনেক যুক্তি সাজাই। কিন্তু যুক্তিগুলো মিলে না। খাপছাড়া, এলোমেলো।'
'কাল পরীক্ষা। আর আজ এসব ভেবে সময় নষ্ট করছিস।'

হেমলতার কণ্ঠ স্বাভাবিক। তবুও পদ্মজা ভয় পেয়ে গেল। তবে কিঞ্চিৎ আশা মনে উঁকি দিচ্ছে।

চলবে....
®ইলমা বেহরোজ

আমি পদ্মজা - ১৪
_____
চারিদিক একেবারে নিস্তব্ধ। দূর থেকে একটা আওয়াজ ভেসে এলো। সঙ্গে হুইসেলের শব্দ। গভীর রাতের ট্রেন ছুটে চলেছে গন্তব্যের দিকে। আরেকটা আওয়াজও আসছে। কাছে কোথাও নেড়ি কুকুরের দল ঘেউঘেউ করছে। পদ্মজা ইংরেজি বইয়ের দিকে চোখ রেখে মিনমিনে স্বরে বলল,'পরীক্ষা তো কালদিন পর।'
হেমলতা খোলা চুল মুঠোয় নিয়ে হাত খোঁপা করেন। এরপর বললেন,'কাল আর কালদিন পর একই হলো।'

পদ্মজা চুপ হয়ে গেল। এমন ভান ধরল যেন সে খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ছে। হেমলতা চোখ ছোট করে পদ্মজাকে দেখছেন। মেয়েটা পড়ায় মনোযোগ দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কিন্তু সফল হতে পারছে না। বার বার নিচের ঠোঁট দাঁত দিয়ে টিপছে।

'পদ্ম, ছাদে যাবি?'
হেমলতার এহেন প্রস্তাবে পদ্মজা একটু অবাক হলো। নাকের পাটা হয়ে গেল লাল। এতে নাক লাল হওয়ার কী আছে জানা নেই। পদ্মজা কিঞ্চিৎ হা হয়ে তাকিয়ে রইল। হেমলতা আবার বলেন,'যাবি?'

Kobitor.com

পদ্মজা টেবিল থেকে প্রফুল্লচিত্তে ছুটে এলো। বলল,'যাব।'

আকবর হোসেনের বাড়িটির নাম সিংহাসনকুঞ্জ। বাড়ির নাম এমনটা হওয়ার কারণ ছাদে না গেলে জানা সম্ভব নয়। মা-মেয়ে সিঁড়ি বেয়ে ছাদের দিকে উঠছে। তাদের পায়ের শব্দ মোহময় ছন্দ তুলে হারিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে। অথবা মিলে যাচ্ছে চাঁদের আলোর সাথে একাকার হয়ে। ছাদের ঠিক মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল সিংহাসন। তা দেখে পদ্মজার চক্ষু চড়কগাছ। বিস্ময় নিয়ে প্রশ্ন করল,'আম্মা! এত বড় সিংহাসন কার?'

হেমলতা পদ্মজার মুখের ভাব দেখে বেশ আনন্দ পাচ্ছেন। তিনি দুইদিন আগে এই সিংহাসন আবিষ্কার করেছেন। আকবর হোসেনের কাছে প্রশ্ন করেছেন, ঠিক পদ্মজার মতো করেই। আকবর হোসেনের উত্তর হেমলতা পুনরাবৃত্তি করলেন,' তোর আকবর কাকার আব্বু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। বাংলা সাহিত্যের। উনার ইচ্ছে ছিল,নিজের বাড়ির ছাদে একটা সিংহাসন করার৷ শেষ বয়সে এসে ইচ্ছে পূরণ করেন। দিনরাত নাকি রাজকীয় ভঙ্গীতে সিংহাসনে বসে থাকতেন। মৃত্যুও হয় সিংহাসনে ঘুমানো অবস্থায়।'

পদ্মজা হা অবস্থায় স্থির হয়ে রইল। সে সিংহাসন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। ময়ূর সিংহাসন! সিংহাসন যেন পেখম মেলে দাঁড়িয়ে আছে। ইট-সিমেন্টের তৈরি সিংহাসন। অনেক বড় দেখতে। পাঁচ ফুট দৈর্ঘ্যের বা আরো বেশি হবে৷ হেমলতা বলেন,'মোঘল সম্রাট শাহজাহানের সিংহাসনের মতো সিংহাসনের স্বপ্ন বোধহয় তিনি দেখতেন। অর্থের জন্য পারেননি।'

হেমলতার কথা পদ্মজা শুনল নাকি বোঝা গেল না। পদ্মজা অনুরোধ করে অন্য কথা বলল, 'আম্মা, সিংহাসনে বসো তুমি।'

এক কথায় হেমলতা সিংহাসনে বসেন। এরপর পদ্মজাকে ডাকেন পাশে এসে বসতে। পদ্মজা আসল না। দূর থেকে বলল, 'মাঝে বসো আম্মা।'
'কী শুরু করেছিস।'
'বসো না।'
হেমলতা কপাল কুঁচকে সিংহাসনের মাঝে বসেন। পদ্মজার ঠোঁটে হাসি ফুটে আবার হারিয়ে গেল। বলল,'আরেকটু বাকি।'
'কি বাকি?'
'বাম পায়ের উপর ডান পা তুলে রানিদের মতো বসো।'
হেমলতা বিরক্তি নিয়ে উঠে পড়েন। পদ্মজাকে বলেন,'পাগলের প্রলাপ শুরু করেছিস!'
পদ্মজা নাছোড়বান্দা হয়ে দৃঢ়ভাবে বলল,'আম্মা, বসো না। নইলে আমি কাঁদব।'

পদ্মজার এমন কথায় হেমলতা হাসবেন না রাগবেন ঠাওর করতে পারলেন না। রাতের সৌন্দর্য, রাতের মায়াবী রূপ প্রতিটি মানুষের ভেতরের আহ্লাদ, ইচ্ছে, কষ্ট, ঠেলেঠুলে বের করে আনার ক্ষমতা বোধহয় নিজে আল্লাহ সাক্ষাৎ করে দিয়েছেন। তাই হেমলতা তার নিজের শক্ত খোলসে ফিরতে পারলেন না। পদ্মজার পাগলামোর সুরে সুর মিলিয়ে তিনি সিংহাসনে রাজকীয় ভঙ্গীতে বসেন। পদ্মজার কেমন কেমন অনুভূতি হয়। বুকের ভেতর ঝিরিঝিরি কাঁপন। এইতো তার কল্পনার রাজ্যের রাজরানি হেমলতা। এবং তার কন্যা সে পদ্মজা। চোখের মণিকোঠায় ভেসে উঠল একটি অসাধারণ দৃশ্য। হেমলতার সর্বাঙ্গে হীরামণি-মুক্তার অলংকার। অসম্ভব সুন্দর

শ্যামবর্ণের এই সাহসী নারীকে দেখতে কতশত দেশ থেকে মানুষ ভীড় জমিয়েছে। আর সে হেমলতার পাশে বসে আছে। চারিদিকে ঢাকঢোল পিটানো হচ্ছে। হাতিশাল থেকে হাতির হুংকার আসছে। তারাও যেন খুশি এমন রানি পেয়ে।

'তোর পাগলামি শেষ হয়েছে?'
পদ্মজা জবাব দিল না। হেমলতার পাশে এসে বসল। কোলে মাথা রেখে গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়ল। এরপর আক্ষেপের স্বরে বলল,'আম্মা, তুমি রানি আর আমি রাজকন্যা কেন হলাম না। সবাই আমাদের ভালোবাসত। সম্মান করতো। মুগ্ধ হয়ে দেখতো।'

হেমলতার বুক চিঁরে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসল। সমাজ কেন তার প্রতিকূলে থাকল? কেন পদ্মজা ছোট থেকে সমাজের কারোর মেয়ের সাথে মেশার অধিকার পেল না? তিনি বললেন,'জন্ম যেভাবেই হউক। জীবনে সফলতা না এনে মৃত্যুতে ঢলে পড়া ব্যক্তির ব্যর্থতা। তুই এমন জায়গায় যাওয়ার চেষ্টা কর যাতে মানুষ সম্মান করে। সম্মান করতে বাধ্য হয়। চোখ তুলে তাকাতেও যেন ভয় করে। যারা দূরছাই করেছে তাদের যেন বিবেকে বাঁধে।'
'পারব আমি?'
'কেনো পারবি না? পুরো জীবন তো দুঃখে,অবহেলায় যায় না।'
'তোমার জীবন থেকে এতোগুলো বছর দুঃখে আর অবহেলায় তো গেছে আম্মা।'

হেমলতা কিছু বলতে পারলেন না। তিনি জীবনে কী পেয়েছেন? উত্তরটা চট করে পেয়ে গেলেন। পদ্মজাকে বলেন,'আমার মেয়ে তিনটা আমার সফলতা। আমার অহংকার। প্রেমা তো ছোট। তোরা দুইজন নিজেদের মতো থাকিস, পড়িস, কোনো দুর্নাম নাই। এজন্য মানুষ বলে, এইযে এরা হচ্ছে হেমলতার মেয়ে। তখন আমার অনেক কিছু পাওয়া হয়ে যায়।'

পদ্মজা আশ্বস্ত করে বলল,'কখনো ভুল কাজ করব না আম্মা। তোমাদের সম্মান আমাদের জন্য আংশিকও নষ্ট হতে দেব না।'

হেমলতা পদ্মজার মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। নিস্তব্ধতা ভেঙে ভেঙে মাঝে মাঝে পাতার ফাঁকে ফাঁকে পাখ-পাখালির ডানা নাড়ার শব্দ ভেসে আসছে। পদ্মজা চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল। আকাশে একটা চাঁদ, অগণিত তারা। আকাশকে তারায় পরিপূর্ণ একটি কালো গালিচার মত লাগছে। হেমলতা বিভ্রম নিয়ে বললেন,'সমাজের সাথে আমার সখ্যতা কখনো হয়ে উঠেনি। কালো রংয়ের দোষে। প্রকৃতির মতিগতি অবস্থা দেখে দেখে আমার সময় কাটে। আব্বা শিক্ষক ছিলেন বলে, কালো হয়েও পড়ার সুযোগ পাই। অবশ্য আব্বার সামর্থ্যও ছিল। আমাদের সব ভাই-বোনকে পড়িয়েছেন। আম্মা আমাকে পড়ানোতে বেশি আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। রং কালো। কেউ বিয়ে করবে না। একটু পড়ালেখা থাকলে হয়তো করবে,সেই আশায়। যখন আমি তোর বয়সে ছিলাম বড় আপার মেয়ে হয়। মেয়েটার গায়ের রং কালো। শ্বশুর বাড়িতে তুলকালাম কান্ড। বংশের সবাই ফর্সা। বাচ্চা কেন কালো হলো। আপাকে বের করে দিল। আপা বাপের বাড়ি ফিরল। সমাজের কতো কটুক্তি কথা হজম করেছে আপা। তখন আমি নামাযের দোয়ায় আকুতি করে চাইতাম একটা সুন্দর মেয়ের। আমার বিয়ে হলে,মেয়েটা যেন পরীর মতো সুন্দর হয়। আমার মতো অবহেলার পাত্রী যেন না হয়৷ বড় আপার মতো কালো মেয়ে নিয়ে শ্বশুর বাড়ি থেকে বিতাড়িত হতে যেন না হয়। তুই যখন পেটে,এবাদত বাড়িয়ে দেই। পাঁচ ওয়াক্ত নামায বাদে সময় পেলেই সেজদায় লুটিয়ে আল্লাহকে একই কথা বলতাম। আমার পরীর মতো মেয়ে চাই। দোয়া

কবুল হলো। তোর যেদিন জন্ম হয়, সবাই অবাক হয়ে শুধু তাকিয়েই ছিল। আমি তো খুশিতে কেঁদেই দিয়েছিলাম। এতো সুন্দর বাচ্চা এই গ্রামে কেন, পুরো দেশেও বোধহয় ছিল না। চোখের পাপড়ি যেন ভ্রুতে এসে ঠেকছিল। ঠোঁট এতো লাল ছিল। যেন ঠোঁট বেয়ে রক্ত ঝরছে। সদ্য জন্মানো শিশুর মাথা ভর্তি ঘন কালো রেশমি চুল।অলন্দপুরের সবার কাছে ছড়িয়ে পরে এই কথা। দল বেঁধে দেখতে আসে। এক সপ্তাহ বেশ তোড়জোড় চলে। কী খুশি ছিলাম আমি। সারাক্ষণ তোকে চুমোতাম। রাতেও ঘুমাতে ইচ্ছে করত না। মনে হতো এই বুঝি আমার পরীর মতো মেয়ে চুরি হয়ে গেল। তোর আব্বা সারাক্ষণ খুশিতে বাকবাকম করতো। বাইরে থেকে এসে গোসল ছাড়া কোলে নিত না। যখন কোলে নিত বার বার আমাকে বলতো, 'ও লতা। ছেড়িডা মানুষ না শিমুল তুলা।'
হেমলতা থামেন। চোখ তার ছলছল। পদ্মজা বলল,'তারপর?'
'কেউ বা কারা ছড়িয়ে দিল তুই তোর বাপের মেয়ে না। যুক্তি দাঁড় করাল। বাপ,মা কালো মেয়ে এতো সুন্দর কেন হবে? গ্রামের প্রায় সব মানুষ অশিক্ষিত। তাই বিবেচনা ছাড়াই বিশ্বাস করে নিল।
'

হেমলতা চুপ হয়ে যান। পদ্মজা টের পেল হেমলতা কিছু একটা লুকিয়েছেন। শুধু গ্রামের মানুষ বললেই এতো বড় দাগ লেগে যায় না কপালে। অন্য কোনো কারণ আছে। যা যুক্তি হিসেবে শক্ত ছিল। হেমলতা দম নিয়ে বলেন,'একা হয়ে যাই। তোর বাপ সরে গেল। সমাজ সরে গেল। আঁতুড়ঘরে একা সময় কাটাতে থাকি। তোকে দেখলেই মনে হতো, আল্লাহ নিজের কোনো মূল্যবান সম্পদ আমাকে দেখে রাখতে দিয়েছেন। আমি অন্য আমি হয়ে যাই। খোলসটা পাল্টে যেতে থাকে। রাত জেগে স্বপ্ন সাজাই। তোর সাথে ফুল কুড়নোর স্বপ্ন দেখি। ফুল গাছ লাগাই। যখন তোর চার বছর হয় বাড়ি ভরে যায় ফুলগাছে। ছোট শাড়ি পরিয়ে প্রতিদিন মা-মেয়ে মিলে ফুল তুলে মালা গেঁথেছি। নিশুতি রাতে পাকা ছাদে জোছনা পোহানোর স্বপ্ন ছিল। আজ পূরণ হলো। আর দুইটা ইচ্ছে বাকি, সাগর জলে মা-মেয়ে পা ডুবিয়ে পুরো একটা বিকেল কাটাব। আর, শেষ বয়সে নাতি-নাতনীদের নিয়ে তাদের মায়ের জীবনি বলব।'

পদ্মজা দু'হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে হেমলতার কোমর। তিনি টের পান পদ্মজা ফোপাঁচ্ছে। উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন,'পদ্ম, কাঁদছিস কেন?'

পদ্মজা বাচ্চাদের মতো কাঁদতে থাকল। কাঁদতে কাঁদতে বলল,'আমাকে কখনো একা থাকতে দিও না আম্মা। আমি তোমাকে ছাড়া থাকতে পারব না। তোমার মতো কেউ হয় না।'

'এজন্য কাঁদতে হয়?আমি সবসময় তোর সাথে আছি। কান্না থামা। কী মেয়ে হয়েছে দেখ! কেমন করে কাঁদছে। পদ্ম, চুপ...আর না...মারব এবার...পদ্ম।'

পদ্মজা থামে। কিন্তু ছটফটানি হচ্ছে ভেতরে। কেন এমন হচ্ছে জানে না। কিন্তু হচ্ছে। কান্না পাচ্ছে। আকাশ ভরা রাতের দিকে তাকিয়ে ভয় হচ্ছে। একটু আগেই সুন্দর লাগছিল এই আকাশ। আচমকা ভয়ংকর মনে হচ্ছে। মায়ের কোল ছাড়তে ইচ্ছে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে, চারিদিকে অশরীরীদের ভীর। তাদের কোলাহলে মস্তিষ্ক ফেটে যাচ্ছে। পদ্মজা মায়ের কোলে মুখ লুকালো।

'পদ্ম,ঘুমিয়ে পড়েছিস?'

'না আম্মা।'

'সেদিন মাঝ রাত্রিরে ছুরি নিয়ে বের হয়েছিলাম। হানিফের ঘরটা আব্বা,আম্মার ঘর থেকে দূরে হওয়াতে সুবিধা ছিল। হানিফের ঘরের পাশে গিয়ে দেখি মদনও ঘরে। দুজনকে সামলানো সম্ভব নয় আমার পক্ষে। তাই অপেক্ষা করতে থাকি মদন কখন যাবে। এরপর আরেকজন লোক আসে। একটু দূরে সরে যাই। গোয়ালঘরের পিছনে। মিনিট কয়েক পর উঁকি দিয়ে দেখি দরজা লাগানো। সাড়াশব্দ নেই। সাবধানে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে দেখি হানিফ নেই। তখন হয়তো আম্মা দেখছে। তাই ভাবছে আমি খুন করেছি।'
'নানু কেন এমন ভাবল? হানিফ মামা তো তোমারই ভাই।'
হেমলতা তাৎক্ষণিক জবাব দিলেন না। সময় নিয়ে একটা গোপন সত্যি বললেন,'আমি তোর নানুর ভাইকে খুন করেছি। তাই তিনি আমাকে ঘৃণা করেন। ভয় পান। সন্দেহ করেন।'

হেমলতার কণ্ঠ স্বাভাবিক। পদ্মজা চমকে উঠে বসল। মুখখানা হা অবস্থায় স্থির হয়ে গেল হেমলতার দিকে। দৃষ্টি গেল থমকে। হেমলতা পদ্মজাকে সামলে নিতে সময় দেন। দূরের রাতের আকাশে চোখ রাখেন। পদ্মজা নিজেকে ধাতস্থ করে নিয়ে বলল,'তিনি কী হানিফ মামার মতো ছিলেন?'

হেমলতা সম্মতিসূচক মাথা নাড়ান। সিঁড়িতে কারো পায়ের আওয়াজ। হেমলতা সাবধান হয়ে যান। পদ্মজাকে আড়াল করে দাঁড়ান। সেকেন্ড কয়েক পর একটা ছেলের দেখা মিলল। অচেনা মুখ। হেমলতা আগে কখনো দেখেননি। ছেলেটিও তাদের দেখে ভড়কে গেল।

চলবে...
®ইলমা বেহরোজ

আমি পদ্মজা - ১৫
_____
ভোর বেলার সূর্য উদয়ের সময় পরিবেশে মৃদু সূর্যালোক ছড়িয়ে পড়ল। ট্রেনের জানালা দিয়ে সূর্যের আগুনরঙা আলো পদ্মজার মুখশ্রী ছুঁয়ে দিল। ফজরের নামায পড়ে ট্রেনে উঠেছে তারা। গন্তব্য অলন্দপুর। পদ্মজার মেট্রিক শেষ হলো আজ তিন দিন। হেমলতার কাঁধে মাথা রেখে চোখ বুজল পদ্মজা। পুরো দেড় মাস পর পূর্ণা,প্রেমা,প্রান্তর দেখা পাবে। খুশিতে আত্মহারা সে।

মাঝে একটু জিরিয়ে ফের চলছে ট্রেন। হেমলতা জানালার বাইরে তাকিয়ে আকাশ দেখছেন। কারণে, অকারণে তিনি এখন আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন। শুষ্ক চক্ষুদ্বয় যখন তখন সজল হয়ে উঠে। কিছুতেই বারণ মানে না। নীল আকাশের বুকে যেন সেদিন রাতের স্মৃতি আকার নিয়ে ভেসে উঠল। ছেলেটার বয়স তেইশ-চব্বিশ বছর হবে। অবাক চোখে তাকিয়েছিল। দেখতে বেশ ভাল। হেমলতা পদ্মজাকে আড়াল করে কঠিন স্বরে প্রশ্ন করেন, 'কে তুমি?'
ছেলেটি হেমলতার কথার ধরনে বিব্রতবোধ করল।ইতস্তত করে বলল,'মুহিব, মুহিব হোসেন।'
হেমলতার টনক নড়ল। তিনি সাবধানে জিজ্ঞাসা করলেন,'বারেক হোসেন তোমার বাবা?'

মুহিব ভদ্রতা সহিত বলল,'জ্বি।'

হেমলতা কী যেন বলতে চেয়েছিলেন,বলতে পারলেন না। তার আগে মুহিব বলল,'বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। আমি আসছি।' এরপরই হন্তদন্ত হয়ে চলে গেল। সেদিন আর রাত জাগা হলো না। ছাদ থেকে নেমে গেল তারা। গোপন বৈঠকে একবার বাঁধা পড়লে আর মন সায় দেয় না আলোচনা চালিয়ে যেতে। অনুভূতি গুলো ভোতা হয়ে যায়।

এরপরদিন জানা গেল, মুহিব তার পিতার সাথে রাগ করে ঢাকা ছেড়ে চাচার বাড়ি উঠেছে। এখনকার ছেলে-মেয়েদের ক্ষমতা খুব। তারা খুব সহজ কারণে মা-বাবার সাথে রাগ করে দূরে সরে যেতে পারে। হেমলতা অবজ্ঞায় কপাল কুঞ্চিত করতে সঙ্কোচবোধ করলেন না। পরে অবশ্য বুঝেছেন, মুহিব খুবই ভাল ছেলে। নম্র,ভদ্র,জ্ঞানী। মেধাবী ছাত্র। বিএ পড়ছে। সবচেয়ে ভাল গুণ হলো, মুহিবের নজর সৎ। হেমলতা চোখের দৃষ্টি চিনতে ভুল করেন না। ঠিক সতেরো দিন পর বারেক হোসেন ছেলেকে নিতে আসেন। যেদিন আসেন এরপরদিন রাতে হেমলতাকে প্রস্তাব দেন। মুহিবের বউ হিসেবে পদ্মজাকে নিতে চান। হেমলতা অবাক হোন। মুহিব মনে মনে পদ্মজার উপর দূর্বল অথচ বোঝা গেল না। নিঃসন্দেহে মুহিব পাত্র হিসেবে উপযুক্ত। মুহিবের বড় দুই ভাই মুমিন, রাজীব। দুজনই চাকরিজীবী। মুমিন বিয়ে করে বউকে ডাক্তারি পড়াচ্ছে। সমর্থনে আছে পুরো পরিবার। অতএব বোঝা গেল, পরিবারের প্রতিটি মানুষের মস্তিষ্ক, ভাবনা উচ্চ মানের। বারেক হোসেন বিয়ের প্রস্তাবের সাথে এটিও বলেছেন,'আমার মেয়ে নেই। ছেলের বউরাই আমার মেয়ে। আপনার মেয়ের যতটুকু ইচ্ছে পড়বে। কোনো বাঁধা নেই।'

হেমলতা প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন না। তিনি আনন্দ সহিতে জবাব দিলেন,'পদ্মজা আইএ শেষ করুক। এরপরই না হয়।'

বারেক হোসেন হেসে বলেন,'তাহলে এটাই কথা রইল।'

স্মৃতির পর্দা থেকে চোখ সরিয়ে নিলেন হেমলতা। গোপনে দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন। গলাটা কাঁপছে। ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ। ব্যাগ থেকে বোতল বের করে পানি পান করলেন।

_____

প্রেমা,প্রান্ত বাড়ির বাইরে সড়কে পায়চারি করছে। পূর্ণা গেইটের আড়াল থেকে বার বার উঁকি দিয়ে দূর রাস্তা দেখছে। মোর্শেদ হেমলতা আর পদ্মজাকে আনতে গঞ্জে সেই কখন গেল, এখনো আসছে না। পুরো দেড় মাস পর মা-বোনের সাক্ষাৎ পাবে তারা। হৃদপিণ্ড দ্রুতগতিতে চলছে। মিনিট পাঁচেক পর কাঁচা সড়কের মোড়ে মোর্শেদের পাশে কালো বোরখা পরা দুজন মানুষকে দেখতে পেল তারা। পূর্ণা লাজলজ্জা ভুলে আগে আগে ছুটে গেল। পিছনে প্রান্ত এবং প্রেমা। ছুটে এসে মা-বোনকে একসাথে জড়িয়ে ধরে প্রবল কণ্ঠে কেঁদে উঠল পূর্ণা। হেমলতা পূর্ণাকে ধমক দিতে গিয়েও থেমে গেলেন। মাঝে মাঝে একটু বাড়াবাড়ি করা দোষের নয়। পদ্মজার চোখ বেয়েও টপটপ করে জল পড়ছে। প্রায় প্রতিটা রাত সে ভাই বোনদের মনে করেছে। বিশেষ করে পূর্ণাকে বেশি মনে পড়েছে। মনে হচ্ছে কত শত বছর পর দেখা হলো। আর পূর্ণা বাড়ির আনাচে কানাচে পদ্মজার শূন্যতা অনুভব করেছে। সে অশ্রুসিক্ত চোখ মেলে তাকাল পদ্মজার দিকে। এরপর আবার জড়িয়ে ধরে বলল,'আপা, আমার এতো আনন্দ হচ্ছে। এতো আনন্দ কখনো হয় নাই।'

পদ্মজার কোমল হৃদয় পূর্ণার ভালবাসা দেখে বিমোহিত হয়ে উঠল। সে স্নেহার্ধ কণ্ঠে বলল,'আমার সোনা বোন। আর কাঁদিস না।'

পূর্ণা চোখের জল দ্রুত মুছল। প্রফুল্লচিত্তে বলল,' আপা, আমি তোমার পছন্দের চিংড়ি মাছ দিয়ে লতা রেঁধেছি।'

পদ্মজা অবাক চোখে তাকাল। হেমলতা প্রশান্তিদায়ক সুখ অনুভব করলেন। এক বোনের প্রতি আরেক বোনের নিঃস্বার্থ ভালবাসা দেখে। পদ্মজা বাকহারা হয়ে পূর্ণার দুই গালে চুমো দিল। মোর্শেদ দৃশ্যটি মুগ্ধ হয়ে দেখেন। এরপর তাড়া দেন, 'দেহো মাইয়াডির কারবার। মানুষ আইতাছে। আর হেরা রাস্তায় কান্দাকাটি লাগাইছে। হাঁট সবাই,হাঁট।'

খাওয়া দাওয়া শেষ করে চার ভাই বোন ঘাটে গিয়ে বসল। দেড় মাসে কী কী হলো, না হলো সব পূর্ণা বলছে। প্রেমা পূর্ণার নামে বিচার দিল। প্রান্ত প্রেমার নামে বিচার দিল। প্রান্ত কেন বিচার দিল, তা নিয়ে প্রেমা বাকবিতন্ডা লাগিয়ে দিল। সে কী কান্ড! দুজন তুমুল ঝগড়া লেগে গেল। এরপর দুজনই বিচার নিয়ে গেল হেমলতার কাছে। তখন পদ্মজা শুষ্ককন্ঠে পূর্ণাকে বলল,'জানিস পূর্ণা, আম্মা আমার বিয়ে ঠিক করছে।'

পূর্ণা ভীষণ চমকাল। চমকিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল,'কবে? কার সাথে?'

'যে বাড়িতে ছিলাম ওই বাড়ির ছেলের সাথে। বিএ পড়ছে। আমার আইএ শেষ হলে বিয়ের তারিখ পড়বে।'

'আপা, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। আম্মার না ইচ্ছে তোমাকে অনেক পড়াবে। তোমার চাকরি হবে।'

পদ্মজা চুপ থাকল ক্ষণকাল। এরপর বলল,'আম্মার কী যেন হয়েছে। পাল্টে গেছেন।'

'কী রকম?'

'আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন। বেশিরভাগ কথা এড়িয়ে যান। আমার ভবিষ্যত নিয়ে আগের মতো আগ্রহ দেখান না। আমি কথা তুললে এড়িয়ে যান। গল্প করেন না। মানে,আগের মতো নেই।' কথাগুলো বলতে গিয়ে পদ্মজার গলা কিঞ্চিৎ কাঁপল।
'সেকী!'
'সত্যি।'
'কিছু হয়েছে ওখানে?'
'না। আমি যতটুকু জানি তেমন কিছুই হয়নি।'

পূর্ণা সীমাহীন আশ্চর্য হয়ে চিন্তায় ডুবল। পদ্মজা শূন্যে তাকিয়ে রইল। লিখন শাহ নামে মানুষটার কথা মনে পড়ছে। তিনি যখন শুনবেন এই খবর, সহ্য করতে পারবেন? সত্যি ভালবেসে থাকলে সহ্য করতে কষ্ট হবে নিশ্চয়ই। পূর্ণা দ্বিধাভরে প্রশ্ন করল, 'আপা, লিখন ভাইয়ের কী হবে?'
পদ্মজা ক্লান্ত ভঙ্গিতে তাকাল। বলল, 'আমি তাকে বলেই দিয়েছি, আম্মা যা বলবেন তাই হবে।'

পূর্ণার বড্ড মন খারাপ হয়ে গেল। তার আপার মতো সুন্দরীকে শুধুমাত্র লিখন শাহর পাশেই মানায়। কত স্বপ্ন দেখল সে, লিখন শাহ এবং পদ্মজাকে নিয়ে। সব স্বপ্নে গুড়ো বালি। সে কাতর কণ্ঠে বলল, 'লিখন ভাইয়ের সাথে তোর বিয়ে না হলে আমি কষ্ট পাব খুব।'
'আমিতো আম্মার কথার বাইরে যেতে পারব না।'
পূর্ণা গলার স্বর খাদে এনে বলল,'যদি লিখন ভাই রাজি করাতে পারে?'
পদ্মজা অবিশ্বাস্য দৃষ্টি নিয়ে তাকাল। সেই দৃষ্টি যেন ইঙ্গিত দিচ্ছে, এ হওয়ার নয়! পূর্ণা কপাল কুঁচকে ফেলল। বিরক্তিতে বলে উঠল,'ধ্যাত!'

_____
বাতাসটা গরম গরম ঠেকছে। ক্রমশ মাথা ব্যাথা বেড়ে চলেছে। এতো এতো গাছগাছালি চারিদিকে তবুও এতটুকুও শীতলতা নেই পরিবেশে। হেমলতা আলমারির কাপড় গুছিয়ে বিছানার দিকে তাকালেন। মোর্শেদ এই রোদ ফাটা দুপুরে কখন থেকে ঝিম মেরে বিছানায় বসে আছে। মুখখানা বিমর্ষ, চিন্তিত। হেমলতা প্রশ্ন ছুঁড়লেন, 'কোনো সমস্যা?'

মোর্শেদ তাকিয়ে আবার চোখ সরিয়ে নিলেন। হেমলতা তাকিয়ে রইলেন জবাবের আশায়। ক্ষণকাল সময় নিয়ে মোর্শেদ বললেন,'বাসন্তী এই বাড়িত আইতে চায় থাকবার জন্যে।'

হেমলতার চোখ দু'টি ক্রোধে জ্বলে উঠে আবার নিভে গেল। নির্বিকার কণ্ঠে বলেন,'তোমার ইচ্ছে হলে নিয়ে এসো। বাড়ি তো তোমার।'

মোর্শেদ চকিত চোখে তাকান। তিনি ভেবেছিলেন হেমলতা রাগারাগি করবে। মোর্শেদের চোখ দু'টির দৃষ্টি তীক্ষ্ণ রূপ নিল। কিড়মিড় করে হেমলতাকে বলেন, 'আমি তারে চাই না।'

হেমলতা ঠাট্টা করে হাসলেন। বললেন,'বিশ বছর সংসার করে এখন তাকে চাও না! আমি হলে মামলা ঠুকতাম।'

মোর্শেদ আহত মন নিয়ে তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। চোখ দুটিতে অসহায়ত্ব স্পষ্ট। হেমলতা নিজেকে নিয়ন্ত্রণে এনে সরে পড়েন। মোর্শেদ তখন কপট রাগ নিয়ে নিজে নিজে আওড়ান,'আমারে ডর দেহায়। মা*ডারে খুন করতে পারলে জীবনে শান্তি পাইতাম।'

হেমলতা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকান। মোর্শেদকে পরখ করে নেন। রাগে ছটফট করছে মোর্শেদ। বাসন্তীর প্রতি তার এতো রাগ কেন? তিনি দু পা এগিয়ে আসেন। বললেন,'ভালোবাসার মানুষকে এভাবে গালি দিয়ে ভালোবাসা শব্দটির সম্মান খুইয়ে দিও না। '

'আমি তারে কোনকালেও ভালোবাসি নাই। বাসলে তোমারে বাসছি।'

হেমলতা ভীষণ অবাক হয়ে, চোখ তুলে তাকান। ভোতা অনুভূতি গুলো মুহূর্তে নাড়াচাড়া দিয়ে উঠল। মোর্শেদ অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। দৃষ্টি অস্থির। বিছানা থেকে নেমে, গটগট পায়ে বেরিয়ে যান। হেমলতা মোর্শেদের যাওয়ার পানে তাকিয়ে থাকেন,ঝাপসা চোখ মেলে। এই মানুষটার থেকে এই একটি শব্দ শোনার জন্য একসময় কত পাগলামি করেছেন তিনি। কত কেঁদেছেন। আকুতি,

মিনতি করেছেন। সত্য হোক কিংবা মিথ্যে হেমলতার ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। বয়সটা কম হলে আজ তিনি অনেক পাগলামি করতেন,অনেক!

_____

পূর্ণার ভীষণ জ্বর। তাই পূর্ণাকে নানাবাড়ি রেখেই পদ্মজা বাড়ি ফিরল। সাথে এলো হিমেল, প্রান্ত,প্রেমা। বাড়িজুড়ে ছোটাছুটি করে লাউ,শিম,লতা,পুঁইশাক বন্দোবস্ত করল। হিমেল বাজার থেকে মাছ এনে দিল। বাড়িতে শুটকি ছিল। আজ হেমলতা আর মোর্শেদ ফিরবে। তাই এতো আয়োজন। দুই দিন আগে ঢাকা গেলেন তারা। হেমলতার বড় বোন হানির মেজো মেয়ের বিয়ের কথাবার্তা চলছে। হানি বলেছেন,হেমলতা না গেলে তিনি বিয়ের তারিখ ফেলবেন না। তাই বাধ্য হয়ে হেমলতা গিয়েছেন। তবে,পদ্মজার খটকা লাগছে শুরু থেকে। তার মা তাকে রেখে পাশের এলাকায় যেতেও আপত্তি করেন। আর আজ দু'দিন ধরে তিনি মাইলের পর মাইল দূরে পদ্মজাকে ছাড়া রয়েছেন। এসব এখন ভাবার সময় নয়। পদ্মজা যত্ন করে কয়েক পদের রান্নার প্রস্তুতি নিল। সকাল থেকে সূর্যের দেখা নেই। পরিবেশ ঠান্ডা,স্তব্ধ। এ যেন ঝড়ের পূর্বাভাস। প্রান্ত-প্রেমা উঠান জুড়ে মারবেল খেলছে। হিমেল শুধু দেখছে। মাঝে মাঝে প্রবল কণ্ঠে হাসছে। হাত তালি দিচ্ছে। রান্না শেষ হলো বিকেলে। প্রেমা,প্রান্ত,হিমেলকে খাবার বেড়ে দিল পদ্মজা। খাওয়া শেষ হলে বলল,'হিমেল মামা, প্রান্ত আর তুমি পূর্ণারে নিয়ে আসো। সন্ধ্যা হয়ে যাবে একটু পর। আম্মা,আব্বাও চলে আসবে।'

হিমেল, প্রান্ত বের হতেই পিছন পিছন ছুটে গেল প্রেমা। পদ্মজা একা হয়ে গেল। রান্নাঘর গুছিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। বাতাস বইছে প্রবলবেগে। বাতাসের দাপটে চুল, ওড়না উড়ছে। আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেছে। পরিবেশ অন্ধকার হয়ে আসছে ধীরে ধীরে। মনটা কু গাইতে লাগল। পদ্মজা এক হাত দিয়ে অন্য হাতের তালু চুলকাতে চুলকাতে গেইটের দিকে বারংবার তাকাচ্ছে। যতক্ষণ কেউ না আসবে শান্তি মিলবে না। বিকট শব্দ তুলে কাছে কোথাও বজ্রপাত পড়ল। ভয়ে পদ্মজার আত্মা শুকিয়ে গেল। চারিদিক কেমন অন্ধকার হয়ে এসেছে! ঘোমটা টেনে বাড়ি থেকে বের হওয়ার সিদ্ধান্ত নিতেই আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। বিকট বজ্রপাত, দমকা হাওয়া, বড় বড় ফোটার বৃষ্টি। সব মিলিয়ে প্রলয়ঙ্কারী ঝড় বইছে যেন। লাহাড়ি ঘরের মাথার উপরে থাকা তাল গাছ অবাধ্য বাতাসের তেজে একবার ডানে আরেকবার বামে ঝুঁকে পড়ছে। পদ্মজার গায়ের পশম দাঁড়িয়ে গেল ভয়ে। ছুটে গেল নিজের রুমে। বিছানার উপর কাচুমাচু হয়ে বসল। টিনের চালে ধুমধাম শব্দ হচ্ছে। বৃষ্টির বেগ বেড়ে চলেছে। এতসব শব্দ ভেদ করে আরেকটি শব্দ কানে এলো। সদর ঘরে কিছু একটা পড়েছে। পদ্মজা ভয় পেয়ে গেল। পরপরই খুশিতে আওড়াল,'আম্মা আসছে।'

বিছানা থেকে নেমে হন্তদন্ত হয়ে সদর ঘরে আসল। সদর ঘর অন্ধকারে তলিয়ে আছে। জানালা দিয়ে আসা ইষৎ আলোয় পদ্মজা টের পেল একজন পুরুষের অবয়ব। সাথে সাথে সর্বাঙ্গ অসাড় হয়ে পড়ল। পা'দুটি স্তব্ধ হয়ে গেল। পদ্মজা কাঁপা কণ্ঠে বলল,'কে আপনি? খালি বাড়িতে কেন ঢুকেছেন?'

কোনো জবাব আসল না। পদ্মজা অনুরোধ করে ভেজা কণ্ঠে বলল,' বলুন না কে আপনি?'

একটি ম্যাচের কাঠি জ্বলে উঠল। সেই আলোয় দু'টি গভীর কালো চোখ বিভ্রম নিয়ে তাকিয়ে রইল পদ্মজার দিকে। শীতল, স্পষ্ট কণ্ঠে চোখের মালিক বলল,'আমির হাওলাদার।'

পদ্মজা পুরুষালী কণ্ঠটি শুনে আরো ভড়কে গেল। রগে,রগে বরফের ন্যায় ঠান্ডা সুক্ষ্ম কিছু একটা দৌড়ে গেল। এক হাত দরজায় রেখে, পদ্মজা আকুতি করে বলল,'আপনি চলে যান। কেন এসেছেন?'

উত্তরের আশায় না থেকে পদ্মজা দৌড়ে নিজের রুমে চলে গেল। রুমে ঢুকেই দরজা লাগিয়ে দিল। মস্তিষ্ক শূন্য হয়ে পড়েছে। কাজ করছে না। লোকটা যদি সম্মানে আঘাত করে বা গ্রামের মানুষ যদি দেখে ফেলে খালি বাড়িতে অচেনা পুরুষের সাথে, কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। সে আর ভাবতে পারছে না। দরজায় করাঘাত শুনে পদ্মজা রুমের সব আসবাবপত্র ঠেলেঠুলে দরজার কাছে নিয়ে আসল। এরপর মাটিতে বসে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। দু'হাত মাথায় রেখে আর্তনাদ করে ডাকল,'আম্মা, কই তুমি? আমি খুব একা আম্মা। আম্মা...।'

চলবে....
ইলমা বেহরোজ

আমি পদ্মজা - ১৬

_____

টিনের চালে ঝুম ঝুম শব্দ। বৃষ্টির এই ছন্দ অন্যবেলা বেশ লাগলেও এই মুহূর্তে ভয়ংকর লাগছে পদ্মজার। একেকটা বজ্রপাত আরো বেশি ভয়ানক করে তুলেছে পরিবেশ। সে কাচুমাচু হয়ে ফোঁপাচ্ছে। বৃষ্টির শব্দ একটু কমলে কিছু কথা ভেসে আসে বাতাসে,'আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন? আমাকে ভয় পাবেন না। বিপদে পড়ে এই বাড়িতে উঠেছি৷ বিশ্বাস করুন।'

পদ্মজা কান্না থামাল। কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করল। দরজার ওপাশ থেকে আমির নামের মানুষটা বলছে,'দরজা খুলুন। বিশ্বাস করুন আমাকে। আমি আপনার সাথে কোনো সুযোগ নিতে আসেনি। ভয় পাবেন না।'
পদ্মজা একটু নড়েচড়ে বসল। আমির আবার বলল,'শুনছেন?'
পদ্মজা ঢোক গিলে কথা বলার চেষ্টা করল। কথা আসছে না। এরপর খ্যাঁক করে গলা পরিষ্কার করল। বলল,'আ...আমি দরজা খুলব না।'
ক্ষণকাল উত্তর আসল না। এরপর আমির বলল,'আচ্ছা, খুলতে হবে না। আপনি ভয় পাবেন না প্লীজ।'
'আপনি চলে যান।'
'বৃষ্টি থামতে দিন। হঠাৎ বৃষ্টির জন্যই তো আপনার বাড়িতে উঠা। আমার বৃষ্টিতে সমস্যা হয়।'

আমিরের মুখে স্পষ্ট শুদ্ধ ভাষা শুনে পদ্মজা বুঝল, লোকটা শিক্ষিত। কথাবার্তা শুনে ভালো মানুষ মনে হচ্ছে। তবুও সাবধানের মার নেই। সে দরজা খুলল না। বিছানায় গিয়ে বসল। ভয়টা কমেছে।

'শুনছেন?'
পদ্মজা জবাব দিল,'বলুন।'

'আপনার নাম কী? ডাকনাম বলুন।'
'পদ্মজা।'
' সুন্দর নাম। আমার নাম জিজ্ঞাসা করবেন না?'
'জানি।'

আমির অবাক হওয়ার ভান ধরে প্রশ্ন করল,'কীভাবে? আমাকে চিনেন?"
'না, কিছুক্ষণ আগেই নাম বললেন।'
'তখন তো ভয়ে কাঁপছিলেন, নাম শুনেছেন! বাব্বাহ!'

আমিরের কণ্ঠে রসিকতা। পদ্মজা মৃদু হাসল। কেন হাসল জানে না। আমির বলল,'শুনছেন?'
'শুনছি।'
'আপনি কী এরকমই ভীতু?'
'আমার সাহসিকতা প্রমাণ করানোর জন্য এখন বের হতে বলবেন তাই তো?'
ওপাশ থেকে গগন কাঁপানো হাসির শব্দ আসল। আমির হাসতে হাসতে বলল,'বেশ কথা জানেন তো।'
এই বিষয়ের কথাবার্তা এড়িয়ে গেল পদ্মজা। বলল,'বৃষ্টি কমলেই চলে যাবেন কিন্তু।'.
'এতো তাড়াতে হবে না। বৃষ্টি কমলেই চলে যাবো।'
'কষ্ট নিবেন না। খালি বাড়ি তো।'
'বাকিরা কোথায়? এটা মোর্শেদ কাকার বাড়ি না?'
'জি।'
'উনার ধানের মিল তো এখন আমার আব্বার দখলে। ছুটিয়ে নিবেন কবে?'
পদ্মজা অবাক হয়ে দরজার দিকে তাকাল। বিস্ময় নিয়ে বলল,'আপনি মাতব্বর কাকার ছেলে?'
'অবাক হলেন মনে হচ্ছে।'
'মাতব্বর কাকার ছেলের নাম তো বাবু।'
আমির হেসে বলল,'আমার ডাকনাম বাবু। আম্মা আর আব্বা ডাকে। ভাল নাম, আমির।'

পদ্মজা আর কথা বাড়াল না। বজ্রপাত থেমেছে। বৃষ্টি রয়েছে। আমির জিজ্ঞাসা করল,'বাকিরা কোথায় বললেন না?'
'আম্মা,আব্বা ঢাকা। আজ ফেরার কথা ছিল। আর আমার দুই বোন আর ভাই নানাবাড়ি। বোধহয় বৃষ্টির জন্য আসতে পারছে না।'
'এখনো আমাকে ভয় পাচ্ছেন?'
'একটু,একটু।'
'এটা ভালো। অচেনা মানুষকে একেবারেই বিশ্বাস করতে নেই।'

_____
বাসন্তী ভ্যান থেকে নেমে সামনে এগোলেন। মোর্শেদের বাড়িটা তিনি চিনেন না। তাই কোনদিকে যাবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। এদিকে আকাশের অবস্থা ভাল না। রাস্তাঘাটেও মানুষ নেই। ঝড়ো হাওয়া বইছে৷ আরো কিছুটা পথ হাঁটার পর আচমকা ঝড় শুরু হলো। তিনি দৌড়ে একটা বাড়িতে উঠলেন। রমিজ আলি বারান্দায় বসে হুঁকা টানছিল। সিল্কের শাড়ি পরনে,পেট উন্মুক্ত,লম্বা চুলের বেণুনীতে ধবধবে সাদা বাসন্তীকে দেখে তিনি অবাক হয়ে এগিয়ে আসেন। বিস্ময়ে প্রশ্ন করেন,'কেডা আপনে? কারে চান?'

বাসন্তী কেঁপে উঠলেন। ঘাড় ঘুরিয়ে রমিজকে দেখে, লম্বা করে হাসেন। বলেন,'হুট কইরা মেঘখান আইয়া পড়ল তো।'
'তে আপনে কার বাড়িত যাইতেন?'
'মোর্ছেদের বাড়ি।'
রমিজ আলি বিরক্তিকর ভাব নিয়ে সরে যান। ঘরের ভেতর থেকে চেয়ার এনে দেন।
বলেন,'মোর্শেইদদার কী লাগেন আপনে?'

বাসন্তী চিন্তায় পড়েন। গ্রামের মানুষ তো জানে না তার আর মোর্শেদের সম্পর্ক। এখন জানানোটা কতটা যুক্তিসংগত? সেকেন্ড কয়েক ভাবার পর যুক্তি মিলে গেল। গ্রামবাসীকে বলা উচিত। নয়তো সে তার অধিকার কখনো পাবে না। একমাত্র গ্রামবাসীই পারে তার জায়গাটা শক্ত করে দিতে।
বাসন্তী রমিজ আলির চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন,'আমি তার বউ লাগি। পরথম বউ। তার লগে আমার বিছ্ বছরের ছম্পর্ক।'

রমিজ আলির চক্ষুদ্বয় যেন কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইল। মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি পাওয়ার মতো আনন্দ অনুভব করেন। তিনি প্রবল উৎসাহ নিয়ে বলেন,'হের পরের বউয়ে জানে?'
'না।'
'থাহেন কই আপনে?'
'রাধাপুর।'
'লুকাইয়া রাখছিল বিয়া কইরা?'
'হ। এখন মোর্ছেদ আমারে তালাক দিতে চায়। আমার সাথে ছ্ংছার করতে চায় না। তাই আমি আমার অধিকার নেয়ার জন্যে আইছি। আমি তার বাড়িতে থাকবার চাই। আপনেরা আমারে ছাহায্য কইরেন। গ্রামবাছী ছাড়া মোর্ছেদ আমারে জায়গা দিব না।'
রমিজ আলি প্রবল বৃষ্টি, আর বজ্রপাতকে হটিয়ে উঁচু স্বরে বলেন,'আপনের জায়গা করে দেওন আমরার কাম। আপনি চিন্তা কইরেন না।মেঘডা কমতে দেন। এরপর খালি দেহেন কী হয়।'

বাসন্তী চোখমুখ জ্বলজ্বল করে উঠল। ভরসা পাওয়া গেল। রমিজ আলির প্রতিশোধের নেশা পেয়েছে। মোর্শেদ তাকে কতো কটু কথা বলেছে,অবজ্ঞা করেছে,অপমান করেছে। এইবার তার পালা। প্রতিটি অপমান ফিরিয়ে দিবেন বলে শপথ করেন। তিনি বাসন্তীকে ভরসা দিয়ে বলেন,'আপনি বইয়া থাহেন। আমি আরো কয়জনরে লইয়া আইতাছি।"

রমিজ আলি খুশিতে গদগদ হয়ে বেরিয়ে যান। ছইদ, রজব, মালেক, কামরুলকে নিয়ে ফিরেন। সবার হাতে হাতে ছাতা। কামরুল আটপাড়া এলাকার মেম্বার। গ্রামে কোনো অনাচার হলে তা দেখার দায়িত্ব তার। তাই তিনি মাথার উপর বজ্রপাত, ঝড় নিয়েই ছুটে আসেন।

পদ্মজা উসখুস করছে। টয়লেটে যাওয়া প্রয়োজন। প্রস্রাবের বেগ বাড়ছে। এভাবে আর কতক্ষণ থাকা যায়। সাহসও পাচ্ছে না বের হওয়ার। রুমে পায়চারি করল কিছুক্ষণ। চোখ বন্ধ করে জোরে নিঃশ্বাস নিল। এরপর কাঁচি কোমরে গুঁজে নিল। আয়তুল কুরসি পড়ে বুকে ফুঁ দিল। তারপর দরজা খুলল। আচমকা দরজা খোলার আওয়াজ শুনে আমির চমকে তাকাল। আকাশ থেকে

কালো মেঘের ভাব কেটে গেছে অনেকটা। সন্ধ্যার আযান পড়ছে। সালোয়ার,কামিজ পরা পদ্মজাকে দেখে মুহূর্তে হৃদস্পন্দন থমকে গেল তার। পদ্মজা ওড়না টেনে নিল নাক অবধি। এরপর কাঁপা পায়ে আমিরের পাশ কাটাল। আমিরের চোখ স্থির। নিঃশ্বাস এলোমেলো। ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ। পদ্মজা যখন ফিরছিল রুমে তখন আমির ডাকল,'পদ্মজা?'

পদ্মজা দাঁড়াল। মানুষটা খারাপ হলে এতক্ষণে আক্রমণ করতো। যেহেতু করেনি, মানুষটার উদ্দেশ্য খারাপ না। তাই দাঁড়াল। তবে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল না। আমিরের গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি পরা। শার্ট ভিজে গেছে। তাই বারান্দার দড়িতে রেখেছে,বাতাসে শুকাতে। আমির বলল, 'অলন্দপুরে এমন রূপবতী আছে জানতাম না।'

পদ্মজা লজ্জা পেল। বিব্রতবোধও করল। বৃষ্টি প্রায় কমে এসেছে। পদ্মজা বলল,'আপনি এবার আসুন। কেউ দেখলে খারাপ ভাববে।'
'যেতে তো ইচ্ছে করছে না।'

লোকটা বলে কী! এতক্ষণ বলল,বৃষ্টি কমলেই চলে যাবে। এখন বলছে, যাবে না। পদ্মজা ঘুরে তাকাল। চোখের দৃষ্টিতে আকুতি নিয়ে বলল,'চলে যান।'

আমির কিঞ্চিৎ হা হয়ে তাকিয়ে রইল। না চাইতেও পদ্মজা আমিরকে খেয়াল করল। শ্যামবর্ণের একজন পুরুষ। থুতনির মাঝে কাটা দাগ। সাথে সাথে চোখ সরিয়ে নিল পদ্মজা। কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল,'বৃষ্টি কমে গেছে। আম্মা,আব্বা চলে আসবে। চলে যান।'

আমিরের নিস্তব্ধতা পদ্মজাকে বিরক্ত করে তুলল। এতো ঘাড়ত্যাড়া, দুই কথার মানুষ কীভাবে হয়? উঠানে পায়ের শব্দ! কয়েক জোড়া পায়ের শব্দ। বারান্দা থেকে তাকাল আমির এবং পদ্মজা। গ্রামের এতোজনকে দেখে পদ্মজার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। দৌড়ে রুমে ঢুকে পড়ল। রমিজ আলি চেঁচিয়ে ডাকেন,'কইরে মোর্শেইদদা। আকাম কইরা এখন লুকায়া আছস ক্যান? বাইর হ। তোর আকাম ধইরা লইয়া আইছি।'

আমির বারান্দা পেরিয়ে বেরিয়ে আসে। গম্ভীরমুখে বলল,'উনারা বাড়িতে নেই।'

উৎসুক জনতা আমিরকে দেখে অবাক হলো। কামরুল বললেন,' আরে আমির। শহর থেকে আইলা কবে?'

'এইতো চার দিন হলো। আছেন কেমন?'

'এইতো আছি। তা এইহানে কি করো?'

আমির উত্তর দেয়ার আগে রমিজ আলি প্রশ্ন করেন,'বাড়িত কী কেউ নাই?'

আমির বেশ সহজ,সরল গলায় বলল,'আছে। পদ্মজা আছে।'

উপস্থিতি পাঁচ-ছয়জন তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল। সবার দৃষ্টি দেখে আমির বুঝল,সে কত বড় ভুল করে ফেলল। তাহলে পদ্মজা এটারই ভয় পাচ্ছিল? আমির দড়ি থেকে শার্ট নিয়ে দ্রুত পরল। এরপর

কৈফিয়ত স্বরে বলল,'আপনারা যা ভাবছেন তা নয়। বাড়ি ফিরছিলাম। বৃষ্টি নামে তাই এই বাড়িতে উঠে পড়ি। বাড়িতে কেউ নাই জানলে..."

আমির কথা শেষ করতে পারল না। রমিজ আলি চেঁচিয়ে আশেপাশে বাড়ির সব মানুষদের ডাকা শুরু করল। মাতব্বর তাকে কম অপদস্ত করেনি। কোণঠাসা করেছে। মোর্শেদ পথেঘাটে কটু কথা শুনিয়েছে। আজ সেই যন্ত্রণা কমানোর দিন। আমির ভড়কে গেল। কামরুল আঙ্গুল শাসিয়ে কঠিন স্বরে বললেন,'তোমার কাছে এইডা আশা করি নাই। তোমার আব্বারে ডাকাইতাছি। উনি যা করার করবেন।'
আমির বিরক্তি নিয়ে বলল,'আরে আজব! কী শুরু করেছেন আপনারা?'

ছইদ আমিরের বয়সের কাছাকাছি। ব্যক্তিগত ভেজাল আছে তাদের মধ্যে। ছইদ হুংকার ছেড়ে বলল,'চুপ থাক তুই! তোর বাপে মাতব্বর বইলা তোরে ডরাই আমরা? আকাম করবি আর ছাইড়া দিমু?'

আমিরের চোখ লাল বর্ণ ধারণ করে। রেগে গেলে চোখের রং পাল্টে যায় তার। কালো মুখশ্রীর সাথে লাল চোখ ভয়ংকর লাগে। ছইদ ভেতরে ভেতরে ভয় পেল। আমিরের হাতে কম মার সে খায়নি। তবে, আজ সুযোগ আছে৷ পুরো গ্রামবাসী এক দলে। সে কিছুতেই ছাড়বে না। ঢোক গিলে বলে,'চোখ উলডাইয়া লাভ নাই। কুকামের উসুল না তুলে যাইতাছি না।'

আমির রাগে শক্ত হাতে ছইদের কানের কাছে থাপ্পড় দিল। মুহূর্তে ছইদের মাথা ভনভন করে উঠল। ততক্ষণে রমিজের উস্কানিতে মানুষ জমে গেছে। সবার হাতে হাতে টর্চ,হারিকেন। আঁধার নেমে এসেছে। আমির আবারো ছইদকে মারতে গেলে কয়জন এসে জাপটে ধরল। কামরুল একজন মহিলাকে আদেশ স্বরে বলেন,' শিউলির আম্মা কয়জনরে লইয়া মাইয়াডারে বার কইরা আনো। লুকাইছে নটি। গ্রামডা নটিদের ভীরে ধ্বংস হইয়া যাইতাছে'

পদ্মজা মাটিতে নতজানু হয়ে বসে কাঁপছে। দ্রুতগতিতে পা থেকে মাথার চুল অবধি কাঁপছে। বাইরের প্রতিটি কথা কানে এসেছে। চারপাশ যেন ভনভন করছে। শিউলির আম্মা পদ্মজার রুমে আসল। দরজা খোলা ছিল। টর্চ ধরে দেখল পদ্মজা মাটিতে বসে কাঁপছে। সে পদ্মজার মাথায় হাত রেখে বলল,'কেন এমন কাম করছস?'

পদ্মজা ঝাপসা চোখ মেলে তাকাল। শিউলির আম্মা পাশের বাড়ির। পদ্মজার সাথে ভাল সম্পর্ক। পদ্মজা শিউলির মাকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। বলল,'ভাবী আমি কোনো খারাপ কাজ করি নাই। সবাই ভুল বুঝছে।'

রীনা নামে একজন মহিলা পদ্মজাকে জোর করে টেনে দাঁড় করাল। হেমলতার অনেক বাহাদুরি এই মেয়ে নিয়ে। অনেক অহংকার। সেই অহংকার আজ ভাল করে ভাঙ্গবে। সে মনে মনে পৈশাচিক আনন্দে মেতে উঠেছে। ঘৃণিত কণ্ঠে পদ্মজাকে বলল,'ধরা পড়লে সবাই এমনডাই কয়। আয় তুই।'

পদ্মজা আকুতি করে বলল,'বিশ্বাস করুন আমি খারাপ কিছু করিনি। আম্মা এসব শুনলে মরে যাবে। আপনারা এমন করবেন না।'

কারো কানে পৌছালো না পদ্মজার কান্না,আর্তনাদ, আকুতি। সবাই গ্রামের সবচেয়ে সুন্দর মনের, সুন্দর পরিবারের সদস্য গুলোকে ধ্বংস করায় মেতে উঠল। পদ্মজাকে টেনেহিঁচড়ে বের করে আনে। কখনো ঘোমটা ছাড়া কোনো পুরুষের সামনে না যাওয়া মেয়েটার বুকের ওড়না পড়ে রইল ঘরে। তিন-চার জন মহিলা শক্ত করে চেপে ধরে রাখল। সবাইকে উপেক্ষা করে পদ্মজা ঘৃণা চোখে তাকাল আমিরের দিকে। আমির চেষ্টা করছে নিজেকে ছাড়ানোর, কিছুতেই পারছে না। পূর্ণা জ্বরের চোটে কাঁপছে। বাড়িতে ঢুকে দেখল কোলাহল। ভয় পেয়ে গেল। একটু এগিয়ে দেখল,পদ্মজার বিধ্বস্ত অবস্থা। জ্বর মুহূর্তে উবে গেল। দৌড়ে এসে পদ্মজাকে জড়িয়ে ধরল। চেঁচিয়ে উঠল,'আমার আপারে এমনে ধরছেন কেন? আপা..এই আপা? কাঁদছো কেন?'

পদ্মজা কেঁদে বলল,'পূর্ণা, আম্মা মরে যাবে এসব দেখলে। আমি কিছু করি নাই পূর্ণা।'

পূর্ণা কিছু বুঝে উঠতে পারছে না। শুধু অনুভব করছে,তার বুক কাঁপছে। ব্যথায় বিষে যাচ্ছে৷ সে রীনাকে বলল,'খালা আপনি আমার বোনরে এভাভে ধরেছেন কেন? ছাড়েন।'

রীনা কর্কশ কণ্ঠে বলল,'তোর বইনের রস বাইড়া গেছিল। এজন্যে খালি বাড়িত ব্যাঠা ছেড়া ডাইকা আইনা রস কমাইছে।'

পূর্ণার গা রিরি করে উঠল! তেজ নিয়ে বলল,'খারাপ কথা বলবেন না। আমার আপা এমন না।'

পাশ থেকে একজন মহিলা পূর্ণার উদ্দেশ্যে বলল,'তোর মা যেমন হের মাইডাও এমন অইছে। নিজেও এমন কিচ্ছা করল। মাইয়াও করল।'

পদ্মজা চমকে তাকাল। মহিলা বলে যাচ্ছে,'বুঝলা তোমরা সবাই, মায় এক বেশ্যা, মাইয়ারে বানাইছে আরেক বেশ্যা।'

পদ্মজা আচমকা রেগে গেল খুব। আক্রোশে শরীর কাঁপতে থাকল। রীনা সহ দুজন মহিলাকে ঠেলে সরিয়ে দিল। এরপর রাগে চেঁচিয়ে বলল,'আমার মা নিয়ে কিছু বললে,আমি খুন করব। মেরে ফেলব একদম। জিভ ছিড়ে ফেলব ।'

পদ্মজার এহেন রূপে সবাই থতমত খেয়ে গেল। লম্বা চুলগুলো খোঁপা থেকে মুক্ত হয়ে পিঠময় ছড়িয়ে পড়ল। চোখের মণি অন্যরকম হওয়াতে মনে হচ্ছে, কোনো প্রেতাত্মা রাগে ফোঁস ফোঁস করছে। গ্রামের কয়েক মহিলা আবার বিশ্বাস করে, পদ্মজা কোনো পরীর মেয়ে। তাই এতো সুন্দর। এই মুহূর্তে তারা ভাবছে,পদ্মজার ভেতর কেউ ঢুকেছে। তাই সামনে এগোল না। রীনা একাই এগিয়ে আসল। পদ্মজার চুলের মুঠি ধরে বিশ্রি গালিগালাজ করল। এরপর কামরুলকে বলল,'কামরুল ভাই, এই বান্দিরে বাঁন্ধা লাগব।'

পূর্ণা,প্রেমা পদ্মজাকে ছাড়াতে গেলে ছইদসহ আরো তিন চারজন এগিয়ে আসল। অন্ধকারের ভীরে পড়ে পদ্মজা, পূর্ণা, প্রেমা বাজেভাবে উত্ত্যক্ত হলো। কয়টা কালো হাত নিজেদের তৃপ্তি মিটিয়ে নিল। তিন বোনের কান্না,আর্তনাদ কারো হৃদয় ছুঁতে পারল না। হেমলতার অনুপস্থিতিতে তার আদরের তিন কন্যার জীবন্ত কবর হচ্ছিল,বাধা দেয়ার কেউ ছিল না।

Kobitor.com গল্পের ওয়েবসাইট,

চলবে....
®ইলমা বেহরোজ

আমি পদ্মজা - ১৭

_____

নৌকা ছাড়ার পূর্বে আকাশের কালো মেঘের ঘনঘটা চোখে পড়ল। তার কিছুক্ষণ পর হঠাৎই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নেমে এলো। খোলা নৌকা হওয়াতে চোখের পলকে যাত্রী পাঁচজন কাকভেজা হয়ে গেল। ভিজলেন না হেমলতা। মোর্শেদ ছাতা ধরে রেখেছেন। বজ্রপাতের সাথে সাথে হেমলতার আত্মা দুলে উঠছে। মনটা খচখচ করছে। তিনি জলের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন। জলে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার সঙ্গেই বলের মতো একদলা পানি লাফিয়ে উঠছে। তারপর ছোট্ট ছাতার মতো আকৃতি নিয়ে চারপাশে প্রসারিত হয়ে হাওরে মিলিয়ে যাচ্ছে। দেখতে সুন্দর! কিন্তু সেই সৌন্দর্য মনে ধরছে না। অজানা আশঙ্কায় তিক্ত অনুভূতি হচ্ছে। মোর্শেদ গলা খাকারি দিয়ে হেমলতার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেন। এরপর বলেন,'কিছু খাইবা?'

হেমলতা নিরুত্তর। মোর্শেদ শুষ্ক হাসি হেসে বলল,

'আর কিছুক্ষণ। আইয়াই পড়ছি।'

হেমলতা কিচ্ছুটি বললেন না। নিরুত্তরেই বসে রইলেন। বৃষ্টির স্পর্শ নিয়ে আসা হাওরের হিমেল বাতাসের ছোঁয়া লাগছে চোখেমুখে। হাওরের ঘোর লাগা বৃষ্টি দেখতে দেখতে তন্দ্রা এসে ভর করে। হেমলতা নিকাব খুলে চোখেমুখে পানি দিয়ে তন্দ্রা কাটান। এরপর ক্লান্ত চোখ দু'টি মেলে তাকান মোর্শেদের দিকে। মোর্শেদের হাতে হাত রেখে বলেন,'আমার এতো খারাপ লাগছে কেন? বুক পোড়া কষ্ট হচ্ছে।'

মোর্শেদ হেমলতার কণ্ঠ শুনে সহসা উত্তর দিতে পারলেন না। চিত্ত ব্যাথায় ভরে উঠল। কিছুসময় অতিবাহিত হওয়ার পর আশ্বস্ত করে বললেন,'আইয়া পড়ছি তো। ওইযে বাজারের ঘাট দেহা যাইতাছে।'

হেমলতা মোর্শেদের হাত ছেড়ে দূরে তাকান। অলন্দপুরের বাজারটা ছোট পিঁপড়ার মতো দেখাচ্ছে। নৌকাটা বার বার দুলছে। চারিদিকে ঝড় বইছে। মনেও তো বইছে। তিনি নিজেকে শান্ত করতে চোখ বুজে বার কয়েক প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেন। ব্যাথাতুর মন আর্তনাদ করে শুধু জানতে চাইল,আমার মেয়েগুলো কেমন আছে?

_____

রীনা চুল এতো শক্ত করে ধরেছে যে পদ্মজার সারা শরীর ব্যথায় বিষিয়ে উঠছে। পদ্মজা আকুতি করেও ছাড়া পাচ্ছে না। পূর্ণা,প্রেমা খামচে ধরে রেখেছে পদ্মজাকে। কিছুতেই তারা বোনকে ছাড়বে না।

Kobitor.com

আমির ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হয়ে চিৎকার করে উঠল, 'কামরুল চাচা এটা ঠিক হচ্ছে না! মেয়েগুলোর অভিশাপে পুড়ে যাবেন।'

আমিরের উৎকট উত্তেজনায় ক্ষণকালের জন্য কামরুল হতবুদ্ধি হয়ে গেল। রমিজ আলী কামরুলের নরম, নিঃশ্বব্দ, ভয়ার্ত মুখের দিকে চেয়ে ভেতরে ভেতরে উদ্বিগ্ন হয়ে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলল,'বেশ্যাদের শাপে কেউ পুড়ে না।'

জলিল প্রেমাকে সরিয়ে নিয়েছে। প্রেমার কান্না শোনা যাচ্ছে। বড় আপা,বড় আপা করে গলা ফাটিয়ে কাঁদছে। ছইদ অনেক টেনেও পূর্ণাকে সরাতে পারল না, তাই অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে পূর্ণার বুকে নোংরা হাতের দাগ বসিয়ে দিল। পূর্ণা এমন ঘটনার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না। কোনো মেয়েই এমন নীচু ঘটনার সাক্ষী হতে চায় না। অকস্মাৎ এই ঘটনা কাটিয়ে উঠার পূর্বেই একটা শক্ত হাত পায়জামার ফিতা টেনে ধরল। পূর্ণার পায়ের তলার মাটি সরে গেল। ভয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল,'আপা...আপা।'

পূর্ণার আর্তনাদ পদ্মজার মস্তিষ্ক প্রখর করে তুলল। পদ্মজা মুখ তুলে পূর্ণার দিকে তাকাল। তার চেয়ে কয়েক ইঞ্চি দূরে পূর্ণা। পদ্মজার এক হাতে শক্ত করে ধরে রেখেছে সে। কাছে আসতে পারছে না ছইদের জন্য। পূর্ণার কান্না দেখে পদ্মজা আতঙ্কে নীল হয়ে গেল। চারিদিকে কোলাহল। গালি দিচ্ছে মা বাপ তুলে। কেউ বলছে না, মেয়েটা ভালো। এরকম করতেই পারে না। পূর্ণা চেঁচিয়ে যাচ্ছে। কেঁদে মাকে ডাকছে। পদ্মজা এক দৃষ্টে মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। মানুষ এরকম কেন হয়?
পূর্ণার হাত ছইদ আলগা করতেই সে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল পদ্মজাকে। তার পুরো শরীর কাঁপছে। হৃৎপিণ্ড এতো জোরে চলছে যে অনুভব করা যাচ্ছে। পূর্ণা কাঁদতে কাঁদতে বলল,'আপা...আপা...কেন মেয়ে হলাম আপা? এত কষ্ট হচ্ছে আপা। আপা..."

পদ্মজার দু'চোখ বেয়ে টুপ করে দু'ফোটা জল পড়ে। এক হাতে শক্ত করে পূর্ণাকে বুকের সাথে চেপে ধরল। রমিজের উস্কানিতে কামরুল গলা উঁচিয়ে বলল,'নটিরে বাঁন ছইদ।'

পূর্ণার কানে কথাটা আসতেই সে আরো জোরে পদ্মজাকে জড়িয়ে ধরল। পদ্মজা ঠান্ডা স্বরে বলল,'পূর্ণা ছেড়ে দে আমায়।'

রীনা পদ্মজাকে চুলে ধরে টেনে নিয়ে যেতে চাইলেও পদ্মজা জায়গা থেকে এক চুলও নড়ল না। ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। পূর্ণাকে ফিসফিসিয়ে বলল,'বেঁচে থাকলে সব উসুল হবে। ছেড়ে দে।'

পদ্মজার কণ্ঠে কী যেন ছিল। পূর্ণা সাথে সাথে শান্ত হয়ে গেল। চোখ তুলে পদ্মজার দিকে তাকাল। পদ্মজার গাল বেয়ে রক্ত ঝরছে।ছইদ পূর্ণাকে নিতে আসলে পদ্মজা একটি দুঃসাহসিক কাজ করে বসল। ছইদের অণ্ডকোষ বরাবর লাথি বসিয়ে দিল। ছইদ মাগো বলে কুঁকিয়ে উঠল। জলিলসহ উপস্থিত তিন জন তেড়ে আসল পদ্মজার দিকে। পূর্ণাকে ধাক্কা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলল দূরে। অশ্রাব্য গালি দিতে দিতে কেউ পদ্মজাকে থাপ্পড় দিল, কেউ বা দিল লাথি। দু'তিনজন গ্রামবাসীর মনে মায়া উদয় হলো। ছুটে আসল পদ্মজাকে বাঁচাতে। প্রান্ত ভয়ে চুপসে গিয়েছিল। পদ্মজাকে কাঁদায় ফেলে মারতে দেখে দৌড়ে আসে, জলিলের হাতে শরীরের সব শক্তি দিয়ে কামড় দিল। জলিল প্রান্তের কান বরাবর থাপ্পড় বসাতেই প্রান্তের মাথা ভনভন করে উঠল। পরিস্থিতি বিগড়ে যেতে

দেখে কামরুল হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। মনে মনে বেশ ভয় পান। কেশে গলা পরিষ্কার করে, দুই হাত তুলে চেঁচিয়ে বললেন,'তোমরা থামো,এইডা কি করতাছো? থামো, কইতাছি। সবাই সইরা আসো। থামো...!"

সবকিছু থেমে গেল। পদ্মজা কাচুমাচু হয়ে পড়ে রইল কাঁদায়। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। নাভির নিচে একটা লাথি পড়েছে বেশ জোরে। চোখ বুজে রেখেছে। দু'হাত বুকের উপর। লম্বা চুল কাঁদায় মেখে ছড়িয়ে আছে আশেপাশে। যন্ত্রনায় যেন পাঁজরগুলো মড়মড় করে ভেঙ্গে যাচ্ছে। পূর্ণা জ্বরের তোপে জ্ঞান হারিয়েছে। হেমলতার মা মনজুরা বাড়িতে ঢুকে পদ্মজাকে এভাবে পড়ে থাকতে দেখে আঁতকে উঠলেন। দৌড়ে এসে পদ্মজাকে তুলতে চাইলে কামরুল হুংকার ছাড়েন,'এই ছেড়িরে ধরন যাইব না। যান এন থাইকা।'

মনজুরা পদ্মজার কামিজ ঠিক করে দিলেন। এরপর দুজন লোককে নিয়ে পূর্ণাকে তুলে ঘরে নিয়ে গেলেন। মনজুরার বুক কাঁপছে হেমলতার ভয়ে। হেমলতা বার বার বলেছিল, দুই দিন তার মেয়েদের চোখের আড়াল না করতে! আর তিনি একা বাড়িতেই ছেড়ে দিয়েছেন! ইচ্ছে হচ্ছে এক ছুটে কোথাও পালিয়ে যেতে। হিমেল নাক টেনে টেনে কাঁদছে। জপ করছে হেমলতার নাম। মনজুরা রেগে ধমক দেন,'আহ! থাম তো।'

বাপের বাড়িতে কাউকে না পেয়ে হেমলতা চিন্তায় পড়েন। মোর্শেদ বললেন,'আমরার বাড়িত গিয়া বইয়া রইছে মনে হয়। আও বাড়িত যাই।'

হেমলতা মিনমিনে গলায় বলেন, 'তাই হবে।'

দুজন হেঁটে বাড়ির রাস্তায় উঠে। তখন পাশ কেটে একজন মহিলা হেঁটে যায়। কিছুটা হাঁটার পর মোর্শেদের খটকা লাগল। তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকান। মহিলাটি অনেক দূর অবধি চলে গিয়েছে। মহিলার অবয়ব দেখে মোর্শেদের বাসন্তীর কথা মনে হলো। মনে মনে আওড়ান,'বাসন্তী আইছে?' পরপরই নিজের মনকে বুঝ দেন,'না,না হে আইব কেমনে। আর আইলেও যাইব গা ক্যান?'

তিনি আর মাথা ঘামালেন না। হেমলতার বুক দুরুদুরু করছে। ঠান্ডা বাতাস বইছে। তবুও তিনি ঘামছেন অজানা আশঙ্কায়। বাড়ির কাছাকাছি এসে তিনি দেখতে পেলেন,মাতব্বরকে। মাতব্বরের সাথে আরো দুজন ব্যক্তি। এছাড়া বাড়ির সামনে মানুষের ভীরও দেখা যাচ্ছে। হেমলতার হৃৎপিণ্ড যেন থমকে গেল। মেরুদণ্ড বেয়ে বরফের ন্যায় ঠান্ডা কিছু একটা ছুটে গেল। তিনি নিঃশ্বাস বন্ধ রেখে ছুটতে থাকেন। পিছলা খেয়ে পড়ে যেতে গিয়েও নিজেকে সামলে নেন। হেমলতার দৌড় দেখে মোর্শেদ অবাক হোন। প্রশ্ন করেন,'তুমি দৌড়তাছো ক্যান?'

হেমলতা প্রশ্নটি শুনলেন না। নিকাব বাতাসের দমকে উড়ে পড়ল দূরে। তিনি ভীর ঠেলে বাড়িতে ঢুকেন। কোলাহল বেড়ে গেল। এতো ভীরের মাঝে একটা মেয়েকে পড়ে থাকতে দেখে তিনি অবাক হোন। অন্ধকারে মেয়েটিকে চিনতে বেশ অসুবিধা হচ্ছে। তিনি আঙ্গুল তুলে বিড়বিড় করেন,'মেয়েটা কে?'

হেমলতার প্রশ্ন কারো কান অবধি গেল না। কোথা থেকে একটি আলো এসে পড়ে পদ্মজার উপর। সাথে সাথে হেমলতার চক্ষুদ্বয়ের সামনে পদ্মজার কাঁদারক্তে মাখা মুখ ভেসে উঠল। হেমলতা গগণ কাঁপিয়ে আর্ত চিৎকার করে উঠলেন,'পদ্মজারে...."

পদ্মজার বুক ধড়াস করে উঠল! অস্তিত্ব কেঁপে উঠল। আম্মা এসেছে! তার পৃথিবী! তার শক্তি! পদ্মজা দূর্বল দুই হাতে ভর রেখে উঠে বসার চেষ্টা করল। পারল না। ভাঙ্গা গলার জোর দিয়ে শুধু ডাকল,'আম্মা...আম্মা।"
হেমলতার পৃথিবী থমকে গিয়েছে। বিধ্বস্ত, পর্দাহীন,কাঁদা,রক্তমাখা পদ্মজাকে দেখে বিশ্বাস হচ্ছে না, এটা তার মেয়ে। তিনি দ্রুত নিজের বোরখা খুলে পদ্মজাকে ঢেকে, বুকের সাথে জড়িয়ে ধরেন। অসহনীয় যন্ত্রনায় যেন কলিজা বেরিয়ে আসছে তার। তার সোনার কন্যার এ কী রূপ! কে করলো? কাঁপা কণ্ঠে বললেন,'পদ্ম...আমার পদ্ম।"
হেমলতার বুকে মাথা রেখে পদ্মজা হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। বলল,'আম্মা...আম্মা।'

হেমলতা পদ্মজাকে আরো জোরে চেপে ধরেন বুকের সাথে। দৃষ্টি অস্থির। বুক হাঁপড়ের মতো ওঠানামা করছে।

মোর্শেদ বাড়িতে ঢুকে উঁচু গলায় বলেন,'এইহানে এতো মানুষ ক্যান? মাতব্বর মিয়া আপনে এইনে ক্যান? কী অইছে?'

প্রান্ত,প্রেমা দৌড়ে এসে মোর্শেদকে জড়িয়ে ধরল। দুজন ভয়ে কাঁদছে,কিন্তু কান্নার শব্দ হচ্ছে না। মোর্শেদ বিস্ময়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। মাতব্বর মজিদ গম্ভীর কণ্ঠে কামরুলকে প্রশ্ন করেন,' মেয়েটার এই অবস্থা কারা করেছে? এটা কী নিয়মের মধ্যে পড়ে?'

কামরুল মাথা নিচু করে রেখেছেন। মিনমিনে গলায় বলেন,'আমি ছেড়িডারে মারতে কই নাই। জলিল,ছইদ, আর মজনুর ছেড়ায় নিজ ইচ্ছায় মারছে।'

'আপনি আটকালেন না?'

'আটকাইছি বইললাই মাইয়াডা বাঁইচা আছে। আর এমন নটিদের বাঁচার অধিকার নাই।'

'থামেন মিয়া! কার কী শাস্তি হবে সেটা আমার দায়িত্ব। আপনার না। ছইদ,জলিল আর মজনুর ছেলেকে তো দেখা যাচ্ছে না। আগামীকাল তাদের আমি মাঠে দেখতে চাই।'

কামরুল মাথা নিচু করে রাখলেন। মজিদ হাওলাদার ভারি সৎ এবং নিষ্ঠাবান মানুষ। গ্রামের মানুষদের দুই হাতে আগলে রেখেছেন। পুরো অলন্দপুরের মানুষ মজিদকে ফেরেশতা সমতূল্য ভাবে। পঁচিশ বছর ধরে অলন্দপুর সামলাচ্ছেন তিনি।

গুড়িগুড়ি বৃষ্টি পড়ছে। অন্ধকার গাঢ় থেকে গাঢ়তর হচ্ছে। হেমলতা কিছুতেই হিসাব মিলাতে পারছেন না। অনেক বছর আগের ঘটনা আর এই ঘটনা হুবুহু একরকম কী করে হলো? তিনি নিজের ভেতর একটা হিংস্র পশুর উপস্থিতি অনুভব করছেন। কামরুলের মুখ থেকে শোনা তিনটা নাম মস্তিষ্কে নাড়া দিচ্ছে প্রচন্ডভাবে! ছইদ,জলিল আর মজনুর ছেলে!

মজিদ সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন,'আগামীকাল সবাই স্কুল মাঠে চলে আসবেন। মিয়া মোর্শেদ মেয়ে নিয়ে আলো ফুটতেই চলে আসবেন। এই বাড়ি পাহারায় থাকবে মদন আর আলী। আমার ছেলেকে আমি নিয়ে যাচ্ছি। ঠিক সময়ে সেও উপস্থিত থাকবে।'

চলবে....
@ইলমা বেহরোজ

আমি পদ্মজা - ১৮

_____

ভীর কমতেই কানে তালা লাগা প্রচন্ড শব্দে বজ্রপাত হয়। হেমলতা একা পদ্মজাকে তুলতে গিয়ে হিমশিম খান। মোর্শেদ এগিয়ে আসেন। দুই হাতে পাঁজাকোলা করে তুলে নেন পদ্মজাকে। বিজলি চমকাল। বিজলির আলোয় পদ্মজার মুখটা দেখে মোর্শেদের বুক কেমন করে উঠল! কষ্টে বুক চুরমার হয়ে গেল। জন্মের দিন পদ্মজাকে কোলে নেয়ার পর যে অনুভূতিটুকু হয়েছিল ঠিক সেরকম একটা অনুভূতি হয়। অনুভূতিটুকুর নাম বোধহয় পিতৃত্ব! প্রচণ্ড ঝোড়ো বাতাস বইছে। তারা ঘরে ঢুকতেই ভারী বর্ষণ শুরু হলো। মুহূর্তে ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডব দেখা দিল! তবে সেই তাণ্ডব ছুঁতে পারল না মোড়ল বাড়ির মানুষদের মন। ঝড়ের তান্ডবের চেয়েও বড় তান্ডবের সাথে যুদ্ধ করে চলেছে তারা। হেমলতা গরম পানি করে পদ্মজাকে গোসল করালেন। জামাকাপড় পাল্টে দিলেন। পদ্মজা ঠোঁট কামড়ে নীরবে কেঁদে গেল। চোখের জল আটকে রাখতে পারছে না কিছুতেই। ইচ্ছে হচ্ছে বাড়ির পিছনের সবচেয়ে বড় আম গাছটার সাথে ফাঁস লেগে মরে যেতে। মন দূর্বলতার শূন্য ছুঁই ছুঁই। হেমলতা পদ্মজার চুল মুছে কপালে চুমু দিলেন। পদ্মজার নাকে এক ফোঁটা জল পড়ল। পদ্মজা চোখ তুলে মায়ের দিকে তাকাল।

'আম্মা আসছে? আমার আম্মা কই? আম্মা আসে নাই?'

পাশের ঘর থেকে পূর্ণার চিৎকার ভেসে আসল। সেকেন্ড কয়েকের মধ্যে পূর্ণা ছুটে এলো। হেমলতাকে দেখেই ঝাঁপিয়ে পড়ল হেমলতার বুকে। হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। পূর্ণার শরীর আগ্নেয়গিরি মনে হচ্ছে। এতো গরম! জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। পূর্ণার কান্না দেখে পদ্মজাও ডুকরে কেঁদে উঠল। হেমলতা স্তব্ধ হয়ে দুই মেয়ের কান্না শুনলেন। সামলানোর চেষ্টা করলেন না। মনজুরা দরজার সামনে কাচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। টিনের চালে ভারী বর্ষণের শব্দ। জগৎসংসার সেই শব্দে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

মাঝরাত। বাতাসের বেগ প্রচন্ড। হেমলতা কালো রংয়ের শাড়ি পরে, একটা ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে বাড়ির বাইরে পা বাড়ান। মনজুরা বারান্দার ঘর থেকে উঁচু কণ্ঠে বলেন,'রাম দা ব্যাগে ক্যান ঢুকাইছস? আর কোন কেলাঙ্কারি বাকি?'

হেমলতা বিদ্যুদ্বেগে ফিরে দাঁড়ালেন। পলকমাত্র মনজুরার মুখের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করে,নিঃশব্দে ধীরে ধীরে বর্ষণ মাথায় নিয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে মনজুরা শুষ্ক হয়ে উঠলেন। ছুটে পদ্মজার ঘরে গেলেন। পদ্মজা চুপচাপ শুয়ে আছে। মৃদু ফোঁপানোর

আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। পূর্ণা ঘুমাচ্ছে। তিনি এ ঘর ছেড়ে দ্রুত বারান্দার ঘরে আসলেন। বড্ড অস্থির লাগছে। জীবনে প্রথম হেমলতার জীবন ভিক্ষা চেয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়লেন!

_____

ফজরের আযান শোনা যাচ্ছে। বৃষ্টি থেমে গেছে। সবকিছু শান্ত। পদ্মজা ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় আসল। গেইটে শব্দ পেয়ে চমকে তাকাল। উৎসুক হয়ে তাকিয়ে রইল। হেমলতা ঢুকেন। বিধ্বস্ত অবস্থা। মনজুরা পদ্মজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, পদ্মজা টের পেল না। হেমলতা বাড়িতে ঢুকে কাঁধের ব্যাগটা মুরগির খুপীর সামনে ছুঁড়ে ফেলেন। অন্ধকারের জন্য মুখ স্পষ্ট নয়। হেমলতা বাড়ির পিছনের দিকে চলে গেলেন। পদ্মজার বুক দুরুদুরু করছে। সে ধীর পায়ে উঠানে এসে দাঁড়াল। পিছনে মনজুরা। পায়ের শব্দে চমকে তাকাল পদ্মজা, দেখতে পেল মনজুরাকে। ফিসফিসিয়ে বলল,'নানু,আম্মা কোথায় গিয়েছিল?'

মনজুরা ক্ষণকাল নীরব থেকে এরপর বললেন,'জানি না।'

মনজুরার কণ্ঠে ভয়। পদ্মজা দূর্বল শরীর ঠেলে নিয়ে আসল বাড়ির পিছন। দেখতে পেল,হেমলতা নদীতে নেমে গোসল করছেন। এক নিঃশ্বাসে কয়েকটা ডুব দিলেন। পদ্মজা ব্যস্ত পায়ে ঘাটের কাছে এলো। ক্ষীণ স্বরে ডাকল,'আম্মা।'

হেমলতা ঘুরে তাকালেন। ঝড় শেষে আকাশ ধবধবে সাদা । অন্ধকার কাটার পথে। পদ্মজা বলল,'ঠান্ডা লাগবে।'

হেমলতা কিচ্ছুটি বললেন না। গোসল শেষ করে উঠে আসেন উপরে। পদ্মজা আর কিছু বলল না। হেমলতা উঠানে এসে মনজুরাকে বললেন,'পূর্ণারে নিয়ে আসো আম্মা।'

পদ্মজা অবাক হয়ে শুধু দেখছে। পূর্ণা আসে ধীর পায়ে হেঁটে। তার জ্বর অনেকটা কমে এসেছে। মনজুরা দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন। হেমলতা মৃদু হেসে পূর্ণাকে বললেন,'পদ্মজা পাশে এসে দাঁড়া।'

পূর্ণা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। সে বাধ্যের মতো পদ্মজার পাশে এসে দাঁড়াল। হেমলতা মুরগির খুপীর পাশ থেকে কালো ব্যাগটা হাতে তুলে নিলেন। ব্যাগ থেকে একটা রাম দা আর একটা কৌটা বের করলেন। পূর্ণা রাম দা দেখে চমকে উঠল। দু'বোন চাওয়াচাওয়ি করল একবার। হেমলতা রক্তেমাখা রাম দা দুই মেয়ের পায়ের সামনে রাখলেন। শীতল কিন্তু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন,'মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। আর পৃথিবীতে সেরা মানুষগুলোরই বাঁচার অধিকার আছে। মানুষরূপী পশুদের না। যখন যেখানে কোনো মেয়েকে অসম্মান হতে দেখবি এক কোপ দিয়ে অমানুষটার আত্মা দেহ থেকে আলাদা করে দিবি। যে তোকে অসম্মান করেছে সে দোষী, তুই না। তার শাস্তি পাওয়া উচিৎ, তোর না। তাই আত্মহত্যার কথা কখনো ভাববি না। দোষীর আত্মা হত্যা করা উচিৎ। আর আমি মনে করি, এতে পাপ নেই। বরং পাপীকে বিনাশ না করা পাপ। আর আমার মেয়েরা যেন সেই পাপ কখনো না করে। সেই...."

'মেয়েদের এসব কি শিক্ষা দিতাছস তুই? মাথা খারাপ হইয়া গেছে তোর?'

মনজুরা হইহই করে উঠলেন। হেমলতা ঢোক গিলে মনজুরার কথা হজম করে নিলেন। এরপর আবার মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বললেন,' আমি কখনো ছেলে চাইনি। মেয়ে চেয়েছি। প্রতিবাদী, দুঃসাহসীক মেয়ে চেয়েছি। আল্লাহ আমাকে তিনটা মেয়ে দিয়েছেন।
এখন সেই মেয়েরা যদি এইটুকুতে দূর্বল হয়ে পড়ে কীভাবে হবে? ঠিক আগের মতোই মাথা উঁচু করে বাঁচবি। যতদিন আমি আছি কেউ তোদের অসম্মান করে টিকতে পারবে না। আমি না হয় যতদিন বেঁচে থাকি তাদের শাস্তি দেব। পৃথিবী থেকে মুছে দেব। কিন্তু যখন থাকব না? তখন,তখন কী তারা বেঁচে থাকবে? বেঁচে থাকতে দেয়া ঠিক হবে? অন্য কোনো মেয়ের সাথে নোংরামো করবে না তার নিশ্চয়তা আছে? নেই। এখন থেকে নিজেদের শক্ত কর। মেয়েদের সাহস মেয়েদরই হতে হয়। নিজেকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিজের। রাতের স্মৃতি দুঃস্বপ্ন ভেবে ভুলে যেতে বলব না। মনে রাখ। প্রতিটি মানুষের ভেতর লুকানো হিংস্র শক্তি আছে। সবাই প্রকাশ করতে জানে না। চিনতে পারে না নিজেকে। গত রাতের ঘটনাটা মনে রেখে নিজের ভেতর লুকানো হিংস্র শক্তিটাকে জাগিয়ে হাতের মুঠোয় রাখ। যাতে সঠিক সময়ে হাতের মুঠো খুলে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারিস। আঘাতে, আঘাতে চুরমার করে দিতে পারিস পাপের জগত।"

এইটুকু বলে হেমলতা ক্লান্ত হয়ে পড়েন। দপ করে বসে পড়েন। পদ্মজা 'আম্মা' বলে হেমলতাকে ধরতে চাইলে, হেমলতা হাত উঠিয়ে বলেন,'দাঁড়িয়ে থাক।'

হেমলতা সময় নিয়ে দম নেন। এরপর কৌটাটা খুলে ঠান্ডা তরল কিছু ঢেলে দেন দুই মেয়ের পায়ে। পূর্ণা কেঁপে উঠে দূরে সরে গেল। পদ্মজা আতঙ্ক নিয়ে প্রশ্ন করল,'আম্মা, কার রক্ত?'

রক্তের কথা শুনে ঘৃণা আর ভয়ে পূর্ণার সর্বাঙ্গ রি রি করে উঠল। মনে হচ্ছে,পায়ে পোকা কিলবিল করছে। টাটকা তাজা লাল রক্ত! বমি গলায় এসে আটকে গেছে। হেমলতা পদ্মজাকে জবাব দিলেন না। শুধু মৃদু হাসলেন। পূর্ণা এই ভয়ংকর দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে জ্ঞান হারাল। পদ্মজা দু'হাতে জাপটে ধরল পূর্ণাকে। কী আশ্চর্য, এই ভয়ংকর ঘটনা তাকে একটুও বিচলিত করল না! হেমলতার গায়ে ভেজা শাড়ি। তাই পূর্ণাকে ধরলেন না। মনজুরাকে বললেন,'পূর্ণারে ঘরে নিয়ে যাও, আম্মা।'

মনজুরা কঠোর চোখে তাকান হেমলতার দিকে। হেমলতা আবারো হাসেন। ভেজা কণ্ঠে বলেন,'কালো বলে অবহেলা না করে বুকে আগলে রাখলে আমার জীবনটা, আমার মেয়েদের জীবনটা অন্যরকম হতে পারতো আম্মা।"

হেমলতার কথায় মনজুরার সারামুখ বিষণ্নতা ছেয়ে গেল। তিনি হেমলতার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারলেন না। অপরাধবোধে মাথা নুইয়ে ফেললেন। পূর্ণাকে ধরে নিয়ে গেলেন ঘরে। হেমলতা সেখানেই পড়ে রইলেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে জোরে নিঃশ্বাস ফেললেন। আলো ফুটেছে পুরোপুরি। পাখির কিচিরমিচির শোনা যাচ্ছে। পানি দিয়ে উঠানের রক্ত মুছে দিলেন চিরতরে। রাম দা ধুয়ে লুকিয়ে রাখলেন লাহাড়ি ঘরে। শাড়ি পাল্টে উঠানে পা রাখেন। তখন মগা আসল। এসে খবর দিল, বিচার বসবে দুপুরে। রাতের ঘূর্ণিঝড়ে গ্রামের বেশিরভাগ ঘরবাড়ি উড়ে গেছে। পশুপাখি সহ বিভিন্ন ক্ষতি হয়েছে। অনেক মানুষ আহত হয়েছে! এই খবর শুনে হেমলতার চোখ সজল হয়ে উঠল। প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। প্রকৃতি কখনো কাউকে ছাড়ে না! গ্রামবাসী অন্যায় দেখেও নিস্তব্ধ থেকেছিল। এ বুঝি তারই শাস্তি!

Kobitor.com

মাথার উপর সূর্য। প্রচন্ড তাপদাহ । পূর্ণা,পদ্মজা, হেমলতা কালো বোরখার আবরণে নিজেদের ঢেকে নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে অলন্দপুরের মাধ্যমিক স্কুলের উদ্দেশ্যে। খাঁ খাঁ রোদ্দুর, তপ্ত বাতাসের আগুনের হলকা । সবুজ পাতা নেতিয়ে পড়ার দৃশ্য পড়ছে চোখে। মোর্শেদ বাকিদের নিয়ে আসছে। রীনাদের বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার পথে করুণ কান্নার স্বর ভেসে আসে। পদ্মজা চোখ তুলে তাকিয়ে দেখল,রীনার বাড়ির ছাদ উড়ে গেছে। গাছপালা ভেঙ্গে উঠানে পড়ে আছে। হেমলতা পদ্মজাকে টেনে নিয়ে এগিয়ে যান।

বটের ছায়ায় আশ্রয় নিচ্ছিল এক রাখাল ছেলে। সে হেমলতার মুখ দেখে বুঝল, পিছনের দুটি মেয়ে পদ্মজা আর পূর্ণা। ছুটে আসল। পদ্মজাকে উদ্দেশ্য করে বলল,'পদ্ম আপা তুমি ডরাইও না। তোমার কিচ্ছু হইব না।'

চারদিকে নিঝুম , নিস্তব্ধ,ঝিমধরা প্রকৃতি । ঘামে দরদর তৃষ্ণার্ত রাখাল। হাঁপিয়ে কথা বলছে। স্কুলে যাওয়ার পথে, মাঝে মাঝেই এই পনেরো বছর রাখালের সাথে দেখা হতো পদ্মজার। পদ্মজার জন্য পাগল সে। বড় বোনের মতো মান্য করে। পদ্মজা মৃদু করে হাসল। পদ্মজার মুখের উপর পাতলা পর্দা বলে, রাখালের চোখে তা পড়ল না। রাখালকে পিছনে ফেলে তিন মা মেয়ে এগিয়ে চলল।

স্কুল মাঠে অনেক মানুষ জমেছে। রাতের ঘূর্ণিঝড়ের জন্য অলন্দপুরের বেশি অর্ধেক মানুষ আসেনি। তবুও প্রায় পাঁচ'শ মানুষ তো এসেছেই! ঘটনা ঘটেছে আটপাড়ায় আর তা ছড়িয়ে পড়েছে সব পাড়ায়! যথাসময়ে বিচার কার্য শুরু হলো। পদ্মজা এবং আমির দুজন দু'দিকে দাঁড়ানো। মাতব্বর ঠান্ডা গলায় প্রশ্ন করলেন,'এদের একসাথে কারা দেখেছেন?'
রমিজ আলী,কামরুল, মালেক হাত তুলল। মজিদ মাতব্বর বললেন,'কী দেখেছেন? ব্যাখ্যা করুন।'
রমিজ আগে আগে উঁচু কণ্ঠে বলল,'আমি দেখছি ঝড়ের সন্ধ্যায় আপনের পোলারে পদ্মজার ঘর থেকে বাইর হইতে। বাড়িত আর কেউ আছিলো না।'

আমির রেগে গিয়ে কিছু বলতে চাইল, মজিদ মাতব্বর হাতের ইশারায় আটকে দিলেন। আমির বাপের বাধ্য সন্তান তাই থেমে গেল। মজিদ মাতব্বর বললেন,'আপনি আমিরকে পদ্মজার ঘর থেকেই বের হতে দেখেছেন?'

রমিজ আলী দৃষ্টি অস্থির রেখে আমতা আমতা শুরু করলেন। দম নিয়ে বললেন,'তারে বারান্দা থাইকা বাইর হইতে দেখছি।'

মজিদ মাতব্বর নীরব থেকে এরপর বললেন,'তাহলে কোন আন্দাজে আপনি বলছেন,তারা নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত ছিল?'

পদ্মজার সর্বাঙ্গ রি রি করে উঠল। সে চোখ বুজে ফেলল। রমিজ আলী থমকে গিয়ে পরপরই হুংকার দিয়ে উঠেন,'একটা অচেনা ছেড়া খালি বাড়িত কোনো ছেড়ির কাছে কেন যাইব? আপনার নিজের ছেড়া বলে,তার দোষ ঢাকতে পারেন না। আমার ছেড়ির বেলা কিন্তু ছাড়েন নাই।'

'যুক্তি দিয়ে কথা বলুন। আপনার মেয়েকে হাতেনাতে ধরা হয়েছিল। তার গায়ে কাপড় ছিল না। তারা একসাথে একই ঘরের একই বিছানায় ধরা পড়েছে। আমির আর পদ্মজার বেলা সেটা হয়নি।'

মজিদ মাতব্বরের ক্ষমতা এবং কথার দাপটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে রমিজ আলীর। কামরুল চুপসে গিয়েছেন। সামনে নির্বাচন। মজিদ মাতব্বরকে ক্ষেপানো মানে নিজের কপালে দুঃখ বয়ে আনা। ভীরের মাঝ থেকে কেউ একজন বলল,'তাহলে আপনার ছেলে একটা মেয়ের কাছে খালি বাড়িতে গেল কেন?'

মজিদ মাতব্বর উঁকি দিয়ে প্রশ্নদাতাকে খুঁজে বের করলেন। তারই প্রতিপক্ষ হারুন রশীদ! মজিদ মাতব্বর আমিরের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন,'তুমি কেন গিয়েছিলে পদ্মজার বাড়িতে?'

আমির সহজ গলায় বলল,'বাড়ি ফিরছিলাম হঠাৎ ঝড় শুরু হলো। সামনে মোর্শেদ কাকার বাড়ি ছিল। মোর্শেদ কাকা বাড়ি নাই জানতাম না। জানলে,বৃষ্টিতে ভিজতাম। তবুও ওই বাড়ি যেতাম না। এই গ্রামের অনেকেই জানে আমার শ্বাসকষ্ট আছে। বাড়ির সবাই জানে,বৃষ্টিতে ভিজলে ঠান্ডা লাগে। শ্বাসকষ্ট হয়।'

হারুন রশীদ বললেন,'যখন দেখলা ছেড়িডা বাড়িত একলা তখন বাইর হইয়া গেলা না ক্যান?'

আমির সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল,'আমার মাথায় আসেনি এমন কিছু হতে পারে। আর... "
আমির পদ্মজার দিকে একবার তাকাল। পদ্মজা সাথে সাথে চোখ সরিয়ে নিল। আমির বলল,'আর...পদ্মজা কতটা সুন্দর যারা দেখেছে সবাই জানে। আমি প্রথম দেখে অভিভূত হয়ে পড়ি। তাই মস্তিষ্কে একবারো কোনো বিপদের আশঙ্কা আসেনি।'

মজিদ মাতব্বর ছেলের শেষ কথা শুনে অসন্তুষ্ট হলেন। তবুও স্বাভাবিক থেকেই বললেন,'গ্রামবাসী কোনো প্রমাণ ছাড়াই লাফিয়েছে। মেয়েটাকে অপদস্থ করেছে। প্রমাণ ছাড়া কারো বিরুদ্ধে নোংরামো অপবাদ দেয়া অপরাধ।'
মজিদ মাতব্বর কামরুলের দিকে তাকিয়ে তাকে লক্ষ্য করে বললেন,'ছইদ,মজনুর ছেলে আরেকটা কে জানি? কোথায় তারা?'

কামরুল ধীরভাবে বলল,'পাই নাই খোঁজে। মনে হয়, ভয়ে কোনহানো লুকাইছে।'

রমিজ আলী হঠাৎ গমগম করে উঠলেন,'এইডা আমি মানি না। তারারে আপনে ছাইড়া দিতে পারেন না। আপনের ক্ষমতা বেশি দেইখা আপনে এমনে নিজের ছেড়ারে ঢাইকা রাখতে পারেন না। ধূর্তবাজ লোক।'

আমির রেগেমেগে রমিজ আলীকে ধরতে এলে, মজিদ গর্জন করে উঠলেন,'আমির!'

আমির কিড়মিড় করে রাগ হজম করার চেষ্টা করল। হারুন অতিশয় ধূর্ত লোক। তিনি রসিকতা করে বললেন,'সত্য হউক আর মিথ্যাই। বদনাম তো বদনামই।'

মজিদ সবার প্রশ্ন কথা উপেক্ষা করে উপস্থিত গ্রামবাসীর উদ্দেশ্যে বললেন,'আপনাদের আমার বিচারের প্রতি বিশ্বাস আছে?'

সবাই আওয়াজ করে বলল,'আছে।'

মজিদ মাতব্বর তৃপ্তির সাথে হাসলেন। ক্ষণকাল নীরব থেকে উঠে দাঁড়ালেন। কণ্ঠ উঁচু করে বললেন,'মোর্শেদের মেয়েদের সাথে খারাপ হয়েছে। পদ্মজার নামে অনেক প্রশংসা শুনেছি। সে খুবই ভাল মেয়ে। আর আমার ছেলেকেও সবাই চিনেন, সে কেমন। যারা যারা দোষ করেছে তাদের খুঁজে বের করে শাস্তি দেয়া হবে। পদ্মজা আর আমির নামে যে পাপের অভিযোগ করা হয়েছে তার যুক্তিগত প্রমাণ নেই। আর প্রমাণ ছাড়া আমি কখনো কাউকে শাস্তি দেইনি। আজও দেব না। তবে আমি আজ সবার সামনে মোর্শেদ আর তার স্ত্রীর কাছে একটা প্রস্তাব রাখব।'

হেমলতা, মোর্শেদ সহ উপস্থিত সবাই কৌতূহল নিয়ে তাকাল। মজিদ মাতব্বর বললেন,'পদ্মজাকে আমিরের বউ করে নিয়ে যেতে চাই।'

চারিদিকে কোলাহল বেড়ে গেল। সব কোলাহল সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে স্বপ্নাবিষ্টের মত শুধু মজিদ মাতব্বরের প্রস্তাবটি পদ্মজার কানে বাজতে থাকল। জীবনের কোন মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে সে?

চলবে....
@ইলমা বেহরোজ

আমি পদ্মজা - ১৯
_____
সূর্যের প্রখর তাপে সমস্ত প্রকৃতি যেন নির্জীব হয়ে ওঠেছে। উপস্থিত সবার মধ্যে চাপা উত্তেজনা কাজ করছে। রমিজ আলি,হারুন রশীদ নামক ধূর্ত মানুষগুলোর চোখ ছানাবড়া। মজিদ মাতব্বর ধীর শান্ত কণ্ঠে বললেন,'আপনারা চাইলে সময় নিতে পারেন। আজ এখানে...'

হেমলতা কথার মাঝে আটকে দিয়ে বললেন,'আপনি বিয়ের তারিখ ঠিক করুন।'

মজিদ মাতব্বরের প্রস্তাবের চেয়ে এই প্রস্তাবে হেমলতার রাজি হওয়াটা যেন কোলাহল মুহূর্তে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিল। পদ্মজা হতবাক, বিস্ময়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়! মোর্শেদ চোখ বড় করে হেমলতার দিকে দৃষ্টিপাত করেন। আশপাশ থেকে ফিসফিসানি ভেসে আসছে। মজিদ মাতব্বর মৃদু হাসলেন। এরপর আনন্দসহিত সবাইকে নিমন্ত্রণ করলেন,'আগামী শুক্রবার আমার ছেলের সাথে মোর্শেদের বড় মেয়ের বিবাহ। আপনাদের সবার নিমন্ত্রণ রইল।'

কথা শেষ করে হেমলতার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন,'দিন তারিখ ঠিক আছে?'

হেমলতা সম্মতি জানালেন। মোর্শেদ অবাকের চরম পর্যায়ে। কোনো কথা আসছে না মুখে। পদ্মজা ঢোক গিলে ব্যাপারটা হজম করে নিল। মুহিবের সাথে যখন তার বিয়ের আলোচনা হলো তখন সে ভারি অবাক হয়েছিল। লিখন শাহ নামে একটা মানুষকে মনে পড়েছিল। এখন তেমন কিছুই হচ্ছে না। অনুভূতিগুলো ভোঁতা। যা হওয়ার হবে। সেসব নিয়ে ভেবে লাভ নেই। বিচার সভা

ভেঙ্গে গেল। মজিদ মাতব্বর আলাদা করে মোর্শেদের সাথে কথা বলেন। তিনি আগামীকাল নিজ স্ত্রী এবং বাড়ির অন্যান্য বউদের নিয়ে পদ্মজাকে দেখতে আসবেন। মোর্শেদ, হেমলতা সমস্বরে অনুমতি দিলেন। বাড়ি ফেরার পথে অনেকের কটু কথা কানে আসে। পদ্মজা, আমির দুজনেরই চরিত্র খারাপ। এজন্যই বিয়ে হচ্ছে। মাতব্বর ক্ষমতাবান বলে,পুরো ব্যাপারটা ঘুরিয়ে নিয়েছে। কিন্তু,তলে তলে তো নিজেরা জানে তাদের ছেলেমেয়ে কেমন। তাই তাড়াতাড়ি করে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। কেউ একজন খুব বিশ্রীভাবে পদ্মজাকে উদ্দেশ্য করে বলল,' কে জানে, মনে কয়তো ছেড়ি পেট বাঁধাইছে। রাইতে বাপ মারে দিয়া পায়ে ধরাইয়া বিয়া ঠিক করছে।'

পদ্মজার মন তিক্ত হয়ে উঠে। হাঁটতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। এতো নোংরা মন্তব্য সহ্য করা খুব কঠিন। মিথ্যে অপবাদ চারিদিকে। বোরখার আড়ালে পদ্মজার চোখ দু'টি ছলছল করে উঠল। খুব কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে। হেমলতা পদ্মজার একহাত শক্ত করে চেপে ধরেন। মানুষদের ছায়া ছেড়ে ক্ষেতের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার পথে তিনি বললেন,'জীবন খুব ছোট। এই ছোট জীবনে ঘটে অনেক ঘটনা। যে ভাল তার সাথে যে শুধুই ভালই হবে তা কিন্তু ঠিক না, উচিতও না। ভাল খারাপে মিলিয়েই জীবন। তাই বলে,সেই খারাপকে পাত্তা দিয়ে সময় নষ্ট করতে হবে তার কোনো মানে নেই। খারাপটাকে পাশে রেখে ভাল মুহূর্ত তৈরি করার চেষ্টা করবি। ভালটা ভাববি। শুধুমাত্র কয়জনের কথায় কী আসে যায়? পুরো গ্রামবাসী জানে,তুই কেমন। পুরো অলন্দপুরের যত মানুষ আজ এসেছে তাদের মধ্যে বেশির ভাগ মানুষই মনে মনে তোর গুণগান গেয়েছে। তারা মনে মনে বিশ্বাস করে তুই নির্দোষ। কিন্তু চুপ ছিল। যারা খারাপের দলে তারা সংখ্যায় কম বলে কোলাহল করে নিজেদের দাপট দেখাতে চেয়েছিল। সবার অগোচরে বোঝাতে চেয়েছিল,আমরা অনেকজন। কিন্তু পারেনি। কোলাহল কোনো কিছুর সমাধান নয়। এখন যারা নিন্দা করলো তারা নিজেদের নীচু মনের পরিচয় দিয়েছে, সেই সাথে আমলনামায় পাপের সংখ্যা বাড়িয়ে দিল। তাদের শাস্তি পৃথিবী এবং আখিরাত দুটোতেই হবে। একদিন এদের শাস্তি হবেই,এই কথাটা ভেবে খুশি হ। সব ভুলে যা। বাকি জীবন পড়ে রয়েছে। সেসব নিয়ে ভাব। চোখের জল অতি আপনজন এবং আল্লাহর জন্য ফেলা উচিত। এদের মতো কু-মানুষের জন্য না।'

পদ্মজা হুহু করে কেঁদে উঠল। আচমকা হেমলতাকে মাঝপথে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে,কান্নামাখা কণ্ঠে বলল,'তুমি জাদুকর আম্মা। তুমি জাদু জানো।'

হেমলতা পদ্মজার পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন। মোর্শেদ পদ্মজাকে কান্না থামাতে বলতে চাইলে,হেমলতা ইশারায় চুপ করিয়ে দেন। পাশেই বিস্তীর্ন ক্ষেত। গ্রীষ্মের দুপুরের রূপ স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। মোর্শেদের কপাল বেয়ে ঝরঝর করে ঘাম ঝরছে। তার দৃষ্টি থমকে আছে হেমলতার দিকে। একটা অপ্রিয় সত্য সম্ভাবনার কথা মনে হতেই চোখ দুটি ছলছল করে উঠল। তিনি দ্রুত চোখ সরিয়ে, বড় করে নিঃশ্বাস ফেলেন। জীবনের লীলাখেলায় তিনি নিঃস্ব। পদ্মজার কান্না থামার লক্ষণ নেই। হেমলতা ছদ্ম গাম্ভীর্যের সহিত বললেন,'এতো কাঁদলে কিন্তু মারব।'

আকাশ জুড়ে তারার মেলা। জানালা গলে চাঁদের আলো পদ্মজার মুখশ্রী ছুঁয়ে দিচ্ছে। সে বারান্দার ঘরে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। বুকটা কেমন করছে। অনবরত কাঁপছে। হেমলতার উপস্থিতি টের পেয়ে দ্রুত উঠে বসল। হেমলতা পদ্মজার দিকে মুহূর্ত কাল তাকিয়ে রইলেন। পদ্মজা নখ খুঁটছে। হেমলতা বললেন,'ঘুম আসছে না?'

Kobitor.com

পদ্মজা মাথা দুই পাশে নাড়াল। হেমলতা আর কিছু বললেন না। পদ্মজা পিনপতন নীরবতা কাটিয়ে বলল,'মেজো আপার বিয়ের তারিখ পড়ছে?'

হেমলতা পদ্মজার দিকে তাকিয়ে আবার চোখ সরিয়ে নিলেন। বিছানার উপর বসে পদ্মজাকে টেনে কোলে শুতে ইশারা করেন। পদ্মজা শুয়ে পড়ল। মায়ের কোলটা তার এখন ভীষণ দরকার ছিল। হেমলতা পদ্মজার প্রশ্ন এড়িয়ে অন্য কথা তুললেন। বললেন,'আমি জানি না কোনো মা তার মেয়ের কাছে নিজের বিয়ে সম্পর্কিত আলোচনা করেছে নাকি। কিন্তু আমি আমার বিয়ের গল্প তোকে বলতে চাই। শুনবি?'

পদ্মজা সায় দিল। হেমলতা পদ্মজাকে বিয়ের ব্যাপারে আগ্রহী করে তোলার জন্য অতীতে নিয়ে যান,'সেদিন রাতে আব্বা এসে বলল, তিনদিন পর আমার বিয়ে। আমি খুব অবাক হয়েছিলাম। কষ্ট হয়েছিল। আমি আরো পড়তে চেয়েছিলাম। এরপর শুনলাম, যার সাথে আমার বিয়ে হচ্ছে তার পড়াশোনা নেই। জ্ঞানও যথেষ্ট কম। রাগচটা লোক। এসব তথ্য জেনে রাগ,মন খারাপ কিছুই হয়নি। ভয় হয়। না জানি কেমন যাবে সংসার! বিয়ের দিন ঘনিয়ে এলো। তোর আব্বাকে তখনো আমি দেখিনি। বিয়ের দিন আয়নায় প্রথম দেখি। কালো একটা মুখ। চোখ দু'টি গভীর। কখনো না দেখা মানুষটাকে, প্রথম দেখেই মনে হয় আমার সবচেয়ে আপন একজন মানুষ। সব ভয় কেটে গেল। বিদায়ের সময় সবাই বলছিল,দুজনকে খুব মানিয়েছে। রাজযোটক। একজন হিন্দু দিদি বলেছিলেন,সাক্ষাৎ রাম সীতা। আটপাড়ায় যদি একজন ছয় ফুট লম্বার মানুষ থাকে তবে সেটা তোদের আব্বা ছিল। বিয়ের পর জানতে পারি,তোর আব্বাকে বিয়ে করার জন্য অনেক মেয়েই পাগল ছিল। নিজেকে খুব সৌভাগ্যবতী মনে হতো। অশিক্ষিত ভেবে নাক কুঁচকেছিলাম। সেই আমি তোর আব্বার জন্য দিনকে রাত, রাতকে দিন মানতে রাজি ছিলাম। এতোটাই ভালবাসা হয়ে গেছিল যে, তোর আব্বা ছুরি নিয়ে রক্তের আবদার করলে আমি আমার বুক পেতে দিতাম...।"

পদ্মজা মাঝপথে আটকে দিয়ে বলল,'তাও তো আব্বা তোমাকে ভালোবাসেনি আম্মা।'

হেমলতার হাসি উজ্জ্বল মুখটা নিভে গেল। অপ্রতিভ হয়ে উঠলেন। তিনি দৃষ্টি এলোমেলো রেখে বললেন,'তাকে বিয়ে করতে বাধ্য করা হয়েছিল।'

পদ্মজা চুপ করে রইল। হেমলতাও নিশ্চুপ। দরজার পাশে মোর্শেদ বসেছিলেন। বিড়ি ফুঁকছিলেন। হেমলতার প্রতিটি কথা বুড়ো হয়ে যাওয়া মনটাকে দুমড়ে, মুচড়ে দিল। তিনি বিড়ি নিয়ে বেরিয়ে যান চৌরাস্তার উদ্দেশ্যে। চৌরাস্তার পাশে একটা বড় ব্রিজ আছে। ব্রিজে দখিনা হাওয়ার তীব্রতা খুব বেশি। সেখানেই এসে দাঁড়ান। ফেলে আসা জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ চোখ বুজে মনে করার চেষ্টা করেন।

বেশ কিছুক্ষণ পর পদ্মজা বলল,'আম্মা, প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আর প্রশ্ন করব না। তবুও...'
'বলব একদিন।'

পদ্মজা আর জিজ্ঞাসা করল না,কোনদিন বলবে। নিশ্চুপতার অবস্থানে ফিরে গেল। মুহূর্ত কাল স্থির থেকে হেমলতা বললেন,'পূর্ণা খুব কান্নাকাটি করে দেখলাম। মেয়েটা এতো দূর্বল কী করে হলো?'
পদ্মজা হেমলতার এক হাত মুঠোয় নিয়ে আশ্বস্ত করল,'আমি আছি আম্মা। সামলে নেবো।'

'ঘরে যা। রাত হয়েছে অনেক।'

পদ্মজা উঠে বসল। ওড়নাটা ভাল করে টেনে নিয়ে,জুতা পরল। বেরিয়ে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল। হেমলতা বিছানার শেষ অংশ থেকে বালিশ টেনে নেন। বালিশের নিচে দুটি কাগজ ভাঁজ করা ছিল। হেমলতা হাত বাড়িয়ে নেন। পদ্মজার উদ্দেশ্যে বলেন,'পদ্মজা,এগুলো কী?'

হেমলতা ভাঁজ খুলেন। পদ্মজা ফিরে তাকায়। হেমলতার হাতে লিখনের চিঠি দুটি দেখে সর্বাঙ্গে বৈদ্যুতিক কিছু একটা ছড়িয়ে পড়ে,শরীর কাঁপিয়ে দিল। মাটি যেন দুই পা টেনে ধরল। হেমলতা প্রথম লাইন পড়ে বেশ অবাক হোন। পদ্মজার দিকে একবার চকিতে তাকান। এরপর এক নিঃশ্বাসে দুটো চিঠি পড়ে শেষ করেন। পড়া শেষে থম মেরে বসে রইলেন অনেকক্ষণ। ভয়ে পদ্মজার দুই চোখ বেয়ে জল পড়ছে। মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হেমলতা ধীর পায়ে হেঁটে আসেন পদ্মজার কাছে। দু ভ্র প্রসারিত করে, শান্ত অথচ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলেন,' এসব কবে হয়েছে? আমাকে জানাসনি কেন?'

পদ্মজা প্যাচপ্যাচ করে কেঁদে বলল,'যখন উনারা শুটিং করতে আসেন।' পদ্মজার মনে হচ্ছে এখুনি সে অজ্ঞান হয়ে যাবে। কিন্তু কিছুতেই হচ্ছে না। মনে মনে প্রার্থনা করছে,যেন অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতে পারে সে। তাহলে এই লজ্জা থেকে বাঁচা যাবে। হেমলতা পদ্মজাকে পরখ করে নেন। পদ্মজা অস্বাভাবিকভাবে কাঁপছে। বার বার নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরছে। পদ্মজা হেমলতাকে চুপ থাকতে দেখে বলল,'তুমি যা বলবা তাই হবে আম্মা। আমার উপর রেগে যেও না।'

চলবে....
®ইলমা বেহরোজ

আমি পদ্মজা - ২০
_____
আজ যেন শুধু মোড়ল বাড়ির মাথার উপরেই সূর্যটা উঠেছে। সকাল থেকে আত্মীয় আপ্যায়নের প্রস্তুতির তোড়জোড় চলছে। সবাই ঘেমে একাকার। বাড়ির প্রতিটি মানুষ ব্যস্ত। মোর্শেদ হিমেল ও প্রান্তকে নিয়ে বাজার করে ফিরেছেন সূর্য উঠার মাথায়। লাহাড়ি ঘরের পাশে বড় উনুন করা হয়েছে। সাধারণ চালের পরিবর্তে সুগন্ধি (কাটারিভোগ)সিদ্ধ চালের ভাত রান্না করা হয়েছে। ফিরনি, রাজ হাঁসের মাংস রান্না হচ্ছে। বাড়িজুড়ে রমরমা ব্যাপার। একদিন আগের ঘটনা ধামাচাপা পড়েছে ৯৫ ভাগ। ছোট ছোট দরিদ্র ছেলেমেয়েরা খাবারের ঘ্রাণ পেয়ে ছুটে এসেছে মোড়ল বাড়ি। সবার মধ্যেই নতুন উত্তেজনা,নতুন অনুভূতি। শুধু পূর্ণা এখনো সেদিনের ঘটনা থেকে বেরোতে পারছে না। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে ঘরে। পদ্মজা মনজুরা আর শিউলির মাকে কাজে সাহায্য করছিল। হেমলতা ধমকে ঘরে পাঠিয়ে দেন। পদ্মজা ঘামে ভেজা কপাল মুছতে মুছতে ঘরে প্রবেশ করে। পূর্ণার দুচোখ জলে নদী! পদ্মজা বিছানার উপর পা তুলে বসল। পূর্ণা পদ্মজার উপস্থিতি টের পেয়ে, হাতের উল্টো পাশ দিয়ে চোখের জল মুছল। পদ্মজা কণ্ঠ খাঁদে নামিয়ে বলল,'চোখের জল কী শেষ হয় না?'

পূর্ণা নিরুত্তর। পদ্মজা অভিজ্ঞ স্বরে বলল,'দেখ পূর্ণা, এসব মনে রাখলে তোরই ক্ষতি। দেখছিস না,আমি একদিনের ব্যবধানে সব ভুলে হবু শ্বশুরবাড়ির মানুষদের জন্য রান্নাবান্না করছি। তুইও ভুলে যা। তোর বন্ধুরা আসছে। তুই নাকি তাদের ধমকে দিয়েছিস? এটা কিন্তু ঠিক না।'

পূর্ণা পদ্মজার দিকে তাকাল। দৃষ্টি ভীষণ শীতল। পদ্মজাকে বলল,'সত্যি ভুলতে পেরেছো আপা?'
পদ্মজা সঙ্গে,সঙ্গে উত্তর দিল,'ভুলিনি। কিন্তু সহ্য করতে পেরেছি। তোর মতো চোখের জল অপাত্রে ঢালছি না।'
পূর্ণা উঠে বসে,একটা বালিশ বুকে জড়িয়ে ধরে দায়সারাভাবে বলল,'তুমি অনেক শক্ত আপা। আমি খুব দূর্বল। আমি ভুলতে পারছি না।'

পদ্মজা আর এই বিষয়ে কথা বাড়াল না। পূর্ণার গাঁ ঘেঁষে বসে,ফিসফিসিয়ে বলল,'গতকাল রাতে কী হয়েছে জানিস?'
'কি হয়েছে?'
পদ্মজা চারিদিকে চোখ বুলিয়ে বলে,'তোর নায়ক ভাইয়ের চিঠি আম্মার হাতে পড়েছে।'
পূর্ণা আঁতকে উঠে বলল,'সেকী! কখন? কীভাবে?'

'আর বলিস না! সেদিন তুই নানাবাড়ি ছিলি। তখন চিঠি দুইটা বের করেছিলাম। বারান্দার ঘরে বালিশের নিচে রেখে দেই। আর মনে নেই। এরপরেই অঘটন ঘটে। এরপরদিন বিচার বসল। চিঠির কথা ভুলেই গেলাম। বারান্দার ঘরে ছিলাম রাতে,তবুও মনে পড়েনি। আর আম্মা পেয়ে গেল।'

উত্তেজনা, ভয়ে পূর্ণার গলা শুকিয়ে গেছে। প্রশ্ন করল,'আম্মা কী বলছে?'

পদ্মজা ঠোঁট দুটি উল্টিয়ে কী যেন ভাবে। এরপর ব্যথিত স্বরে বলল,'তেমন কিছুই না। এজন্যই আরো ভয় হচ্ছে।'
'কিছুই না?'
'কখন হলো এসব জিজ্ঞাসা করেছে। আমি বললাম,তুমি যা বলবে তাই হবে। এরপর আম্মা অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে ছিল।'
'তারপর?'
'বলল, ঘুমা গিয়ে। শেষ।'

দুই বোন একসাথে চিন্তায় পড়ে গেল। কপাল ভাঁজ করে কিছু ভাবতে শুরু করে। পূর্ণা বলল,'আম্মা তোমার মুখ দেখে বুঝে গেছে তুমি লিখন ভাইকে ভালোবাসো না।'
পদ্মজা অন্যমনস্ক হয়ে বলল,'মনে হয়।'
পূর্ণা খুব বিরক্তি নিয়ে বলল,'লিখন ভাই এতো সুন্দর, তোমাকে এতো ভালোবাসে তবুও কেন ভালবাসোনি আপা? লিখন ভাইয়ের চিঠি তো ঠিকই সময় করে করে পড়তে। বিয়ে করতে কী সমস্যা?'
'আম্মা দিলে তো করবই। সমস্যা নেই।'
'তোমার এই ন্যাকার কথা আমার ভাল লাগে না আপা।'

Kobitor.com

পদ্মজা হেসে ফেলল। পূর্ণার রেগে কথা বলা দেখে। পদ্মজা পূর্ণার এক হাত মুঠোয় নিয়ে বলল,'গতকাল রাতে আম্মা আব্বার প্রতি ভালোবাসাটা আমাকে বলছে। প্রথম দেখেই নাকি আপন,আপন লেগেছিল। আব্বার জন্য আম্মা দিনকে রাত,রাতকে দিন মানতেও রাজি ছিলেন। এতোটা ভালোবাসতেন। আমার তেমন কোনো অনুভূতি হয়নি তোর নায়ক ভাইয়ের জন্য। প্রথম প্রথম কোনো পুরুষের চিঠি পেয়েছিলাম, সবকিছু নতুন ছিল। তাই একটা ঘোরে গিয়ে নতুন অনুভূতির সাক্ষাৎ পাচ্ছিলাম। আম্মার ভালবাসার কথা শোনার পর থেকে মনে হচ্ছে আমি উনাকে ভালোবাসিনি। সবটা মোহ ছিল। দূরে যেতেই উবে গেছে। তবে, উনি খুব অসাধারণ একজন মানুষ। আম্মা উনার হাতে তুলে দিলে আমাকে, কোনো ভুল হবে না। কিন্তু এটা এখন কল্পনাতীত। পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।'

পদ্মজার এতো কথা উপেক্ষা করে পূর্ণা কটমট করে বলল,'তোমার কী কালাচাঁদরে দেখলে আপন আপন লাগে?'
পদ্মজা চোখ ছোট ছোট করে জিজ্ঞাসা করল,'কালাচাঁদ কে?'
পূর্ণা মিনমিনিয়ে বলল,'তোমার হবু জামাই।'
তারপরই গলা উঁচিয়ে বলল,'আমিও কালা জানি। কিন্তু আপা,তোমার জন্য লিখন ভাইয়ের মতো সুন্দর জামাই দরকার।'
পদ্মজা এক হাতে কপাল চাপড়ে বলল,'এখনও লিখন ভাই! যা তোর সাথে তোর নায়কের বিয়ে দিয়ে দেব। এখন আয়,ঘর থেকে বের হ। মুক্তা,সোনামণি,রোজিনা আসছে। তোর সাথে কথা বলবে। আয় বলছি...আয়।'

পূর্ণাকে টেনে নিয়ে বের হলো পদ্মজা।

সূর্য মামার রাগ কমেছে। মোড়ল বাড়ির মাথার উপর থেকে দূরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সদর ঘর ভর্তি মানুষ। হাওলাদার বাড়ির বউদের গ্রামবাসী শেষবার তাদের বিয়েতেই দেখেছে। আবার দেখার সুযোগ হওয়াতে দল বেঁধে মানুষ এসেছে। লোকমুখে শোনা যায়, হাওলাদার বাড়ির মেয়ে-বউদের সারা অঙ্গে সোনার অলংকার ঝলমল করে। মগা-মদন সহ আরো দুজন ভৃত্য মোড়ল বাড়ির গেইটে দাঁড়িয়ে বাড়ি পাহারা দিচ্ছে। পদ্মজাকে শাড়ি পরাচ্ছেন হেমলতা। পদ্মজা এর আগে কখনো শাড়ি পরেনি। পূর্ণা, প্রেমা ছোট হয়েও পরেছে। পদ্মজার কখনো ইচ্ছে করেনি।তাই সে হেমলতাকে বলল, 'প্রথম শাড়ি তুমি পরাবে আম্মা।'

শাড়ি পরানো শেষে, চোখে কাজল এঁকে দেন। ঠোঁটে লিপিস্টিক দিতে গিয়েও,দিলেন না। মাথার মাঝ বরাবর সিঁথি করে চুল খোঁপা করতেই,পূর্ণা ছুটে আসে। হাতে শিউলি ফুলের মালা। হেমলতা মৃদু ধমকের স্বরে বলেন,'এতক্ষণ লাগল!'

হেমলতার কথা বোধহয় পূর্ণার কানে গেল না। পূর্ণা চাপা উত্তেজনা নিয়ে বলল,'আল্লাহ! আপারে কী সুন্দর লাগছে!'

পদ্মজা লজ্জায় মিইয়ে গেল। চোখে মুখে লাল আভা ছড়িয়ে পড়ে। হেমলতা পদ্মজার খোঁপায় ফুলের মালা লাগিয়ে দিয়ে বললেন,'শুধু রূপে চারিদিক আলোকিত করলে হবে না,গুণেও তেমন হতে হবে।'

পদ্মজা বাধ্যের মতো মাথা নাড়াল। তখন হুড়মুড়িয়ে সেখানে উপস্থিত হলো লাবণ্য। দৌড়ে এসে পদ্মজাকে জাপটে ধরে। এক নিঃশ্বাসে বলেও ফেলল,'আল্লাহ, পদ্ম তুই আমার ভাবি হবি। আমার বিশ্বাসই হইতাছে না। মনে হইতাছে স্বপ্ন দেখতাছি। ইয়া...মাবূদ। শাড়িতে তোরে পরী লাগতাছে। বাড়ির সবাই ফিট খাইয়া যাইব। দেহিস।'
পদ্মজা কি বলবে ভেবে পেল না। শুধু হাসল। হেমলতা পদ্মজার মাথার ঘোমটা টেনে দেন। লাবণ্যকে বলেন,'তোমার সইকে নিয়ে যাও।'
পদ্মজা হেমলতার হাতে হাত রেখে অনুরোধ করে বলল,'আম্মা,তুমি আসো।'
হেমলতা হাসেন। পদ্মজার মাথায় এক হাত রেখে বলেন,'কয়দিন পর থেকে এরাই তোর আপন। মা পাশে থাকবে না।'

পদ্মজার চোখ দুটি ছলছল করে উঠে। ছলছল চোখ নিয়ে তাকিয়ে রইল মায়ের দিকে। পদ্মজাকে নতুন বউ রূপে দেখে হেমলতার বুকে ঝড় বইছে। মেয়েটা কয়দিন পর আলাদা হয়ে যাবে। দুই মাস আগে হলে তিনি সাত রাজার ধনের বিনিময়েও মেয়ের বিয়ে দিতেন না।

'আমি আসছি। লাবণ্য যাও তো নিয়ে যাও। পূর্ণা তুইও যা।'

লাবণ্য পদ্মজাকে নিয়ে যায়। পদ্মজার বুক ধড়ফড় করছে। মায়ের যেন কী হয়েছে! সে পিছন ফিরে তাকায়। সাথে সাথে হেমলতা অন্য দিকে ঘুরে তাকান। চোখ থেকে দুই ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে। তিনি দ্রুত তা মুছেন।
সদর ঘর কোলাহলময় ছিল। পদ্মজা ঢুকতেই সব চুপ হয়ে গেল। লাবণ্য পদ্মজাকে ছেড়ে ভারী আনন্দ নিয়ে বলল,'আম্মা,কাকিম্মা,ভাবি,আপারা এইযে পদ্মজা। আমার নতুন ভাবি।'

পদ্মজা চোখ তুলে তাকাল। অলংকারে জ্বলজ্বল করা পাঁচ জন নারীকে দেখে যেন চোখ ঝলসে গেল তার। সবাই তার দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে। পদ্মজা চোখ নামিয়ে ফেলল। তখন কোথা থেকে আবির্ভাব হলো আমিরের। সদর দরজার মুখেই দাঁড়িয়ে ছিল পদ্মজা। পদ্মজাকে দেখে থমকে গেল সে। পদ্মজার পরনে খয়েরি রংয়ের জামদানি শাড়ি। শাড়িতে কোনো মেয়েকে এতো সুন্দর মনে হতে পারে এর আগে অনুভব করেনি আমির। আমিরের লজ্জা খুব কম। সে উপস্থিত গুরুজনদের উপেক্ষা করে পদ্মজাকে বলল,'মাশাআল্লাহ। দিনের বেলা চাঁদ উঠে গেছে।'

লজ্জায় পদ্মজার রগে রগে কাঁপন ধরে। এতো লজ্জাহীন মানুষ কী করে হয়! আমিরের মা ফরিনা ধমকের স্বরে বলেন,'বাবু,এইনে বয় আইসসা।'

আমির পদ্মজাতে দৃষ্টি স্থির রেখে মায়ের পাশে গিয়ে বসল। হেমলতা সদর ঘরে প্রবেশ করতেই আমির ধড়ফড়িয়ে উঠল। ছুটে এসে হেমলতার পা ছুঁয়ে সালাম করল। হবু শ্বাশুড়ির প্রতি আমিরের এতো দরদ দেখে ফরিনা খুব বিরক্ত হলেন। পাশ থেকে ফরিনার জা আমিনা ফিসফিসিয়ে বললেন,'মেয়ের রূপ আগুনের হুল্কা। বাবু এইবার হাত ছাড়া হইলো বলে।'

আমিনার মন্ত্র ফরিনার মগজ ধোলাই করতে পারল না। পদ্মজার রূপে তিনি মুগ্ধ। আমির কালো বলে তিনি ছোট থেকেই আমিরকে বলতেন,'বাবু তোর জন্যি চান্দের লাকান বউ আনাম।' আর সেই কথা রক্ষার পথে। তিনি শুধু পছন্দ করছেন না শ্বাশুড়ির প্রতি আমিরের এতো দরদ! কী

দরকার ঝাঁপিয়ে পড়ে পায়ে ধরে সালাম করার। আমির হেমলতাকে ভক্তির সাথে প্রশ্ন করল,'ভালো আছেন?'

হেমলতা মিষ্টি করে হেসে বলেন,'ভালো আছি। যাও গিয়ে বসো।'

আমির বাধ্যের মতো মায়ের পাশে গিয়ে বসল। মজিদ মাতব্বর, মোর্শেদের সাথে বাইরে আলোচনা করছেন। আর কোনো পুরুষ আসেনি বাড়িতে। তারা বিয়ের আয়োজনে ব্যস্ত। মুহূর্তে পদ্মজার সারা অঙ্গ সোনার অলংকারে পূর্ণ হয়ে উঠল। রূপ বেড়ে গেল লক্ষ গুণ। যার কোনো সীমা নেই। যার সাথেই পদ্মজা কথা বলেছে, সেই এগিয়ে এসে বালা নয়তো হার পরিয়ে দিয়েছে। কি অবাক কান্ড!
সবাই আড্ডা দিচ্ছে। পদ্মজা চুপ করে বসে আছে। কেউ কিছু প্রশ্ন করলে উত্তর দিচ্ছে। লাবণ্য একজনকে উদ্দেশ্য করে বলল,'রানি আপা,বাড়ির পিছনে যাইবা?'
রানি খুশিতে গদগদ হয়ে বলল,'যাব।'

তার খুশির কারণ লাবণ্য কিছুটা ধরতে পেরেছে। রানির একজন প্রেমিক আছে। তাই শুধু সুযোগ খুঁজে দেখা করার। যেখানেই দাওয়াত পড়ে সেখানেই তার প্রেমিক উপস্থিত হয়। লাবণ্য সবার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে পদ্মজা,পূর্ণা,রানিকে নিয়ে বাড়ির পিছনে আসে। রানি বাড়ির পিছনে এসেই ঘাটের দিকে ছুটে যায়। একটা নৌকা এসে ভীরে। নৌকায় কে ছিল দেখা যায় না। রানি নৌকায় উঠে পড়ে। কারো সাথে বিরতিহীন ভাবে কথা বলছে শোনা যায়। পূর্ণা লাবণ্যকে প্রশ্ন করল,'লাবণ্য আপা? রানি আপা কার সাথে কথা বলে?'

'আবদুল ভাইয়ের সাথে।'
'কোন আবদুল?'
'যার কথা ভাবছিস।' কথা শেষ করে লাবণ্য চোখ টিপল। পূর্ণা অবাক হয়ে বলল,'মাস্টারের সাথে!'
লাবণ্য হাসে। রানি এগিয়ে আসে। লাবণ্য বলে,'কথা শেষ?'
'হ চইলা গেছে।'
রানি পদ্মজার দিকে তাকিয়ে বলল,'মাশাআল্লাহ, তুমি এতো সুন্দর। আমার কোলে নিয়া আদর করতে মন চাইতাছে।'
পদ্মজা মুচকি হেসে বলল,'আপনি খুব শুকনা। আমাকে কোলে নিতে পারবেন না।'
'শুকনা হইতে পারি। শক্তি আছে।'

রানির কথা বলার ঢংয়ে সবাই হেসে উঠল। পূর্ণা আমিরকে দেখে পদ্মজার কানে কানে বলল,'আপা তোমার কালাচাঁদ আসছে।'
পদ্মজা পূর্ণাকে চোখ রাঙিয়ে বলল,'কীসব কথা! উনার বোনরা আছে।'

'লাবণ্য,রানি যা এখান থেকে।' আমিরের আদেশ শুনে রানি,লাবণ্য খুব বিরক্ত হলো। রানি কাঁদোকাঁদো হয়ে বলল,'দাভাই,থাকি না।'
আমির চোখ রাঙিয়ে তাকাল। ধমকের স্বরে বলল,'যেতে বলছি যা।'
লাবণ্য বিরক্তিতে, ইশশ! বলে পদ্মজাকে বলল,'আয় অন্যখানো যাই।'
'পদ্মজা থাকুক। তোরা যা।' আমিরের কথা শুনে বেশি চমকাল পদ্মজা। লাবণ্য ফোঁসফোঁস করতে করতে বলল,'কেন? কেন?'

পদ্মজা, পূর্ণা অন্যদিকে ফিরে আছে। আমির দৃষ্টি কঠোর করতেই লাবণ্য,রানি চলে গেল। পূর্ণা চলে যেতে চাইলে পদ্মজা পূর্ণার হাত চেপে ধরে। পূর্ণা পদ্মজার হাত ছাড়িয়ে, ধীরকণ্ঠে বলল,'একা থেকে তোমার কালাচাঁদের ভালোবাসা খাও।'
'ছিঃ।'
পূর্ণা ছুটে চলে গেল। আমির পদ্মজার পাশে এসে দাঁড়াতেই পদ্মজা বলল,'বিয়ের আগে গুরুজনদের না জানিয়ে এভাবে একা কথা বলা ঠিক নয়।'
'কী হবে?'
পদ্মজা কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল,'কলঙ্ক লাগবে।'
'আর কী বাকি আছে?'
'পরিমাণ না বাড়ানোই ভাল।'

পদ্মজার কথা বলতে একটুও গলা কাঁপেনি। বাড়ির ভেতর চলে আসার জন্য পা বাড়াতে আমির পদ্মজার এক হাত থাবা দিয়ে ধরে,আবার ছেড়ে দিল। পদ্মজা ছিটকে দূরে সরে গেল। আমির বলল,'তুমি সত্যি একটা পদ্ম ফুল পদ্মবতী। এজন্যই লিখন শাহর মতো সুদর্শন যুবক তোমার প্রেমে পড়েছে।'

দেখা হওয়ার পর এই প্রথম পদ্মজা চোখ তুলে তাকাল। পরপরই চোখের দৃষ্টি সরিয়ে ছুটে বাড়ির ভেতর চলে গেল। আমির অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। এবার আত্মীয় বিদায়ের পালা। যাওয়ার পূর্বে লাবণ্য একটা কাগজ পদ্মজার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল,'দাভাই দিছে।'

ঘুমাবার আগে পদ্মজা কাঁপা হাতে কাগজটির ভাঁজটি খুলল। কাগজটিতে যত্ন করে লেখা-

সারা অঙ্গ কলঙ্কে ঝলসে যাক
তুই বন্ধু শুধু আমার থাক।

চলবে....
®ইলমা বেহরোজ

Kobitor.com